The Jahangirnagar Review, Part-C, Vol. XXXVI, No. 2, pp 41-66
ISSN 2306-3920, DOI :

একুশ শতকে বাংলাদেশের তাঁতশিল্প ও ফ্যাশন : সমস্যা ও সম্ভাবনা

তরুন কুমার সরকার*

[**সার-সংক্ষেপ :** বাংলাদেশের তাঁতশিল্প একদিকে হাজার বছরের ঐতিহ্যের ধারক, অন্যদিকে গ্রামীণ অর্থনীতির বৃহৎ অংশের জীবিকা। জামদানি, মসলিন, কাতান, খদ্দর, গামছা-এসব শুধু কাপড় নয়, বাংলার বয়নকৌশল, আঞ্চলিক রুচি, সামাজিক ইতিহাস আর মানুষের সৃজনশীলতার বহিঃপ্রকাশ। কিন্তু একুশ শতকে এসে এই শিল্প সবচেয়ে বড় ধাক্কা খেয়েছে বাজার-প্রতিযোগিতা, কাঁচামালের দাম, পাওয়ারলুমের আগ্রাসন আর নীতি-সহায়তার অভাবে। হাতে বোনা কাপড়ের দাম যেমন বেশি, তেমনি বানাতে সময়ও লাগে অনেক-ফলে তাঁতিরা ন্যায্য মূল্য না পেয়ে পেশা ছেড়ে দিচ্ছে, নতুন প্রজন্ম এই ক্ষেত্রকে নিরাপদ ভবিষ্যৎ ভাবছে না। তাঁতশিল্পে এখনো পর্যন্ত-কারিগরদের জন্য বীমা নেই, পেনশন নেই, উৎপাদনে প্রযুক্তি উন্নয়ন নেই, বাজারে নকল পণ্যের বিরুদ্ধে যথাযথ কার্যকর আইন নেই। ফলে তাঁতশিল্প টিকে আছে ঐতিহ্য, আবেগ আর কিছু সচেতন গ্রাহকের উপর, শিল্পনীতি ও রাষ্ট্রীয় পরিকল্পনার উপর নয়-এটাই আজকের বড় সংকট।

অন্যদিকে বাংলাদেশের ফ্যাশনশিল্প একই সময়ে একদম ভিন্ন দিকে বিকশিত হয়েছে। নব্বই-এর দশক পর্যন্ত দেশে পোশাক ছিল ব্যবহারিক সামগ্রী, কিন্তু দুই হাজার দশকের পর ফ্যাশন হয়ে ওঠে পরিচয়, নন্দন, সামাজিক মর্যাদা ও সৃজনশীল ব্যবসার ক্ষেত্র। নতুন ডিজাইনার, ফ্যাশন হাউস, র‍্যাম্প শো, অনলাইন ব্র্যান্ড, ফটোগ্রাফি, স্টাইল ব্লগিং-সব মিলিয়ে ফ্যাশন এখন সাংস্কৃতিক অর্থনীতির কার্যকর শাখা। শহুরে তরুণদের মধ্যে ফিউশন ফ্যাশন জনপ্রিয় হয়েছে-যেখানে শাড়ি এসেছে কেপ স্টাইলে, পাঞ্জাবি হয়েছে শর্ট কাটে, গামছা হয়েছে স্কার্ফে, তাঁতের কাপড়ে হয়েছে ব্লেজার, স্কার্ট, ব্যাগ, জুতা পর্যন্ত। অর্থাৎ ফ্যাশনশিল্প ঐতিহ্যকে শুধু সংরক্ষণ করছে না, বরং রিডিজাইন করে বাজারযোগ্য রূপ দিচ্ছে। এ দিক দিয়ে ফ্যাশন তাঁতশিল্পের জন্য আয়, পরিচিতি ও ভবিষ্যতের নতুন দরজা খুলেছে-যেখানে কাপড় কেবল স্থানীয়ভাবে প্রথাগত উৎপাদন নয়, বরং কনসেপ্ট, গল্প আর ব্র্যান্ড-আইডেন্টিটির অংশ।

তবে দুই শিল্পের জটিল বাস্তবতা ভিন্ন। তাঁতশিল্পে সমস্যা উৎপাদন-সংকট, আর ফ্যাশনশিল্পে সমস্যা কাঠামোগত। তাঁতিরা ন্যায্য দাম পায় না, ডিজাইনাররা নকল ডিজাইনে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তাঁতশিল্পে শ্রম আছে, কিন্তু পরিকল্পিত বাজার নেই; ফ্যাশনশিল্পে বাজার আছে, কিন্তু গবেষণা ও টেকসই নীতি নেই। বিদেশি ফাস্ট ফ্যাশন, সিনথেটিক কাপড়, সস্তা আমদানি-এসবের কাছে বাংলার হাতে বোনা কাপড় দাম ও গতি-দুই দিকেই পিছিয়ে পড়ে। অন্যদিকে ফ্যাশনশিল্পেও চ্যালেঞ্জ কম নয়-উৎপাদনসংকট, কাঁচামালের অভাব, পরিবেশদূষণ, কর্মক্ষেত্রে বৈষম্য, এবং আন্তর্জাতিক মান রপ্তানিতে কাঠামোগত দুর্বলতা। বিশেষ করে নকল জামদানি, প্রিন্টেড মসলিন, ভারতীয় বেনারসি-এইসব নকল

* **তরুন কুমার সরকার :** সহযোগী অধ্যাপক, চারুকলা বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, E-mail : tarunsarker@juniv.edu

ও পাওয়ারলুমের বাজারে আসল কারিগর, আসল ডিজাইন ও আসল ঐতিহ্য বিপন্ন হয়ে পড়ে।

তবু সবচেয়ে বড় ইতিবাচক দিক হলো-এই দুই শিল্প একে অপরের পরিপূরক হয়ে উঠছে। তাঁতশিল্প ঐতিহ্য দেয়, ফ্যাশনশিল্প তাকে আধুনিক ভাষা দেয়। তাঁতি দেয় কাপড়, ডিজাইনার দেয় মূল্য। রাজশাহী সিল্ক, নরসিংদীর তাঁত, টাঙ্গাইলের শাড়ি, সুনামগঞ্জের গামছা-এগুলো এখন শুধু স্থানীয় পণ্য নয়, বরং সম্ভাব্য ব্র্যান্ড-ভিত্তিক বৈশ্বিক পণ্যে রূপ নিতে পারে। বিশ্ববাজারে আজ "হ্যান্ডমেড", "এথনিক", "সাস্টেইনেবল", "স্টোরিটেলিং ফ্যাশন"-এই চার ধরনের পণ্যের ব্যাপক চাহিদা রয়েছে, আর ঠিক এখানেই বাংলাদেশের তাঁত ও ফ্যাশনের ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা সবচেয়ে বড়। যদি রাষ্ট্রীয় নীতি, উদ্যোক্তা-বান্ধব বিনিয়োগ, কারিগর সুরক্ষা, ডিজাইন গবেষণা ও আন্তর্জাতিক বিপণন-এই সবকিছু একসঙ্গে কার্যকর হয়, তবে বাংলাদেশের তাঁতশিল্প টিকে থাকবে শুধু ইতিহাসে নয়, বরং অর্থনীতিতেও; আর ফ্যাশনশিল্প পরিণত হবে "কপি-কালচার" নয়, বরং " নন্দন"-এর শক্তিশালী পরিচয়ে।

সর্বোপরি, একুশ শতকে বাংলাদেশের তাঁতশিল্প ও ফ্যাশনশিল্প একই সঙ্গে ঐতিহ্য রক্ষা ও আধুনিকতার অভিযাত্রায় আছে। এই যুগে টিকে থাকতে হলে প্রয়োজন দক্ষতা উন্নয়ন, প্রযুক্তিগত উদ্ভাবন, বাজার সম্প্রসারণ ও ন্যায্য উৎপাদনব্যবস্থার সমন্বিত প্রয়াস। সমস্যা অনেক, কিন্তু পরিকল্পিত উদ্যোগ নিলে তাঁতশিল্প ও ফ্যাশন মিলিতভাবেই বাংলাদেশের সৃজনশীল অর্থনীতির উজ্জ্বল সম্ভাবনাকে বাস্তবে রূপ দিতে পারে।]

চাবিশব্দ : তাঁতশিল্প, তাঁতি, তাঁতযন্ত্র, ফ্যাশনশিল্প, একুশ শতক, বিবর্তন, রংরেজ, বুটিক হাউস, ঐতিহ্য, জামদানি, মসলিন ও সম্ভাবনা।

ভূমিকা

গবেষকদের মতে অন্তত দুই হাজার বছর আগে থেকে বাংলাদেশের তাঁতশিল্প বিশেষ উৎকর্ষতা লাভ করেছিল এবং তা দেশের সীমানা ছাড়িয়ে বিদেশেও রপ্তানি হতো। সুপ্রাচীনকাল থেকে বাংলাদেশের বিপুল সংখ্যক মানুষ বিভিন্ন ভাবে তাঁতশিল্পের সাথে যুক্ত ছিলো। সারা দেশে যেসব তাঁতপণ্য উৎপন্ন হতো তা ছিল বিভিন্ন মানের এবং সেগুলি দেশের চাহিদা মিটিয়ে বিদেশেও রপ্তানি হতো। বাংলাদেশের তাঁতবস্ত্রের বাজার ছিল খুবই বিস্তৃত। এই বিস্তৃত বাজারের তালিকায় মেসোপটেমিয়া থেকে গ্রীস ও রোম থেকে শুরু করে ইউরোপ, আমেরিকা, আফ্রিকার বিভিন্ন দেশ, এবং থাইল্যান্ড, জাপান, ইন্দোনেশিয়া, জাভাসহ এশিয়ার বিভিন্ন দেশের নাম জানা যায়। বিভিন্ন পরিবর্তন ও উত্থান-পতনের ভেতর দিয়ে প্রবাহিত হলেও মোটামুটি উনিশ শতক পর্যন্ত বাংলাদেশের তাঁতপণ্যের এই বিশাল বাজার পৃথিবীর বুকে অক্ষুন্ন ছিল। বাংলাকে তখন বলা হতো 'পৃথিবীর তাঁতঘর'।

উনিশ শতকে বাংলাদেশের তাঁতশিল্পের ইতিহাসে ব্যাপক পরিবর্তন ঘটে। বাংলাদেশ তথা ভারতবর্ষ প্রাচীনকাল থেকে সুতি বস্ত্রের জন্য স্বয়ংসম্পূর্ণ ছিল। কিন্তু এই দেশটি উনিশ শতক থেকে পরনির্ভরশীল হয়ে পড়ে। প্রাচীনকাল থেকে বাংলাদেশের বস্ত্রসামগ্রির যে সুবিশাল আন্তর্জাতিক বাজার ছিল পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে–সেটার অবসান ঘটে। এর বিপরীতে বিশ শতকের গোড়ায় ভারতবর্ষে কংগ্রেস নেতা মহাত্মা গান্ধির নেতৃত্বে রাজনৈতিক আন্দোলন শুরু হয়। ইতিহাসে এটা 'স্বদেশী আন্দোলন' নামে পরিচিত। এই আন্দোলনের সূত্র ধরে বাংলাদেশে নিজস্ব তাঁতশিল্পের স্থানীয় বাজারটি আবার চাঙ্গা হয়ে উঠেছিল। যদিও তাঁতপণ্যের আন্তর্জাতিক বাজারটি আর কখনোই ফিরে আসেনি।

দীর্ঘ উপনিবেশিক শাসনের পর স্বদেশী আন্দোলন এবং সেই স্বদেশী আন্দোলনের পর ইতোমধ্যে পার হয়ে গেছে প্রায় একশ বছর। এর মধ্যে আমাদের দেশের রাজনৈতিক আকাশে নানারকম পালাবদল ঘটেছে। ১৯৪৭ সালে বাংলাদেশ (তৎকালীণ পূর্ব বাংলা বা পূর্ব পাকিস্তান)

পাকিস্তানের অংশ হিসেবে ব্রিটিশ উপনিবেশিক শাসনের হাত থেকে মুক্ত হয়ে স্বাধীনতা লাভ করে। শুরু হয় পাকিস্তানি শাসন। আবার, ১৯৭১ সালে নয়মাস মুক্তিযুদ্ধের পর পূর্ব বাংলা বা পূর্ব পাকিস্তান স্বাধীনতা লাভ করে এবং বাংলাদেশ নামে পৃথিবীর মানচিত্রে স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে আবির্ভূত হয়।

স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশে মোটামুটি সত্তরের দশক থেকে বিভিন্ন কারুশিল্প প্রতিষ্ঠান লোকশিল্পের বিভিন্ন উপাদানের পাশাপাশি তাঁতপণ্যকে বিশেষ গুরুত্ব দিতে শুরু করেছিল। এর কারণ দেশে একটি নতুন শ্রেণি তৈরি হয়েছিল যারা দেশীয় সংস্কৃতিকে পৃষ্টপোষকতা করতে আগ্রহী ছিল এবং তাদের বিশেষ আগ্রহ ছিল তাঁতবস্ত্রের প্রতি। কিন্তু সনাতনী প্রথায় যেসব তাঁতবস্ত্র তৈরি হচ্ছিল তা শহরের মানুষের রুচি ও নান্দনিকতাবোধের সঙ্গে ঠিক যুতসই ছিল না। কিন্তু গ্রামের নিরক্ষর তাঁতির পক্ষে শহরের মানুষের রুচি সম্পর্কে জানাও সহজ ছিলনা। শ্রেণিগত ব্যবধান একটা বড় অন্তরায় ছিল। এই ব্যবধান ঘোচাতে শহরের বিভিন্ন বুটিক হাউস বা ফ্যাশন হাউসগুলো গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। সত্তরের দশকে শুরু হলেও আশি ও নব্বইয়ের দশকে ফ্যাশন হাউসগুলো বিকশিত হয়ে উঠে। আর গত বিশ বছরে (২০০০-২০২০) এইসব ফ্যাশন হাউসগুলোর সংখ্যা ও পরিমাণ যে শুধু বৃদ্ধি পেয়েছে তাই নয়, বাংলাদেশের তাঁতশিল্পের বাজারে এগুলোর ভূমিকা বিশেষ উল্লেখযোগ্য হয়ে উঠেছে। এছাড়াও, একুশ শতকেই বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় ও প্রতিষ্ঠানে ফ্যাশন ডিজাইন বিষয়টি পাঠদান শুরু হয়েছে। বাংলাদেশের তাঁতশিল্প ও ফ্যাশন ইন্ডাস্ট্রির উপর এর প্রভাব পড়েছে উল্লেখযোগ্য মাত্রায়।

তাঁতশিল্পের সঙ্গে ফ্যাশনের এই ঘনিষ্ঠতা বাংলাদেশের পোশাক-চেতনা বদলে দেয় এক নতুন ধারায়। আগে যেখানে তাঁতশাড়ি ব্যবহারের ক্ষেত্র ছিল মূলত বিয়েবাড়ি, পূজা-পার্বণ বা বিশেষ উৎসব, সেখানে এখন তা হয়ে উঠেছে নিত্যদিনের পোশাক ও পরিচয়ের ভাষা। শহুরে মধ্যবিত্ত ও উচ্চবিত্ত তরুণ প্রজন্ম দেশীয় ফ্যাশনের প্রতি আগ্রহ দেখাতে শুরু করলে তাঁতকলা আর "লোকজ" উচ্চারণে আটকে থাকে না-বরং "নান্দনিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক পরিচয়" হিসেবে নিজেকে নতুনভাবে প্রতিষ্ঠা করে। এ সময় থেকেই স্থানীয় ফ্যাশন ডিজাইনাররা ঐতিহ্যবাহী তাঁতকে আধুনিক ডিজাইনের সঙ্গে মিলিয়ে মিক্স-ম্যাটেরিয়াল, হাফ-সিল্ক কো-অর্ড সেট, তাঁত-ব্লেজার, পাঞ্জাবি, থ্রি-পিস ও ব্রাইডাল কালেকশন তৈরি করতে শুরু করেন। বাংলাদেশি ফ্যাশনের এই রূপান্তর তাঁতকে আরও বিশ্ববান্ধব করে তোলে কারণ ফ্যাশন শুধু পোশাক নয়, সাংস্কৃতিক কূটনীতি ও নৈতিক ভোগদর্শনের বাহক হিসেবে উদ্ভাসিত হয়। বিশ্বের ফাস্ট-ফ্যাশন বিপর্যয়ের বিরুদ্ধে 'সাসটেইনেবল ফ্যাশন' আন্দোলন যখন জোরদার হচ্ছে, তখন বাংলাদেশের তাঁতে বোনা পোশাক পরিবেশবান্ধব, কারিগরনির্ভর ও নৈতিক উৎপাদনের অনুকরণীয় উদাহরণ হিসেবে আন্তর্জাতিক বাজারে মূল্য পাচ্ছে। ই-কমার্স প্ল্যাটফর্ম, স্থানীয় ব্র্যান্ড, ডিজিটাল ক্যাটালগ, ও বিশ্বব্যাপী লাইফস্টাইল-স্টোরগুলো তাঁতপণ্যকে "ক্লাসিক এবং কনটেম্পোরারি" পরিচয়ে পৌঁছে দিয়েছে নতুন ক্রেতাগোষ্ঠীর কাছে।

তবে এই সম্ভাবনা সত্ত্বেও তাঁতশিল্প-ফ্যাশন ইকোসিস্টেম আজ বড় চ্যালেঞ্জের মধ্য দিয়ে এগোচ্ছে। দক্ষ তাঁতির সংখ্যা দ্রুত কমছে; প্রজন্মগত উত্তরাধিকার ভেঙে যাচ্ছে। যুবসমাজ তাঁতকে পেশা হিসেবে নিতে আগ্রহ হারাচ্ছে-কারণ স্থায়ী আয়ের নিশ্চয়তা নেই এবং সরকারি সহায়তা প্রায়শই প্রাতিষ্ঠানিকভাবে অসংগঠিত। নকশা উদ্ভাবনে গবেষণার সীমাবদ্ধতা, বৈশ্বিক বাজারে ব্র্যান্ডিং-সংকট, মধ্যস্বত্বভোগীর দাপটে তাঁতিদের ন্যায্য মূল্য না পাওয়া-এসব সমস্যাই তাঁতশিল্পের ভবিষ্যৎকে অনিশ্চয়তার দিকে ঠেলে দিচ্ছে। কিন্তু সমস্যা যতই গুরুতর হোক, সম্ভাবনাও ততটাই ব্যাপক-কারণ আধুনিক বিশ্বে শুধু গ্লোবাল স্ট্যান্ডার্ডই নয়, এখন স্থানীয়তার শক্তিও আন্তর্জাতিক টেক্সটাইল অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠছে। বাংলাদেশের ফ্যাশন হাউসগুলো যদি তাঁতশিল্পকে উদ্ভাবন, ডিজাইন গবেষণা, আন্তর্জাতিক গ্যালারি-কারিগরশালা, এবং ডিজিটাল ব্র্যান্ডিংয়ের মাধ্যমে পুনর্গঠন

করতে পারে, তবে এই শিল্প একুশ শতকে শুধু ঐতিহ্যের ধারক নয়-সবুজ অর্থনীতির চালিকাশক্তি হিসেবেও প্রতিষ্ঠিত হতে পারে। ফলে তাঁতশিল্প ও ফ্যাশন বাংলাদেশের জন্য শুধু অতীতের গর্ব নয়, বরং ভবিষ্যৎ টেকসই উন্নয়ন, সংস্কৃতিগত মর্যাদা-স্থাপন, এবং আন্তর্জাতিক নান্দনিকতার এক নতুন সম্ভাবনাময় অধ্যায়।

এই প্রেক্ষাপটে একুশ শতকের বাংলাদেশে তাঁতশিল্প ও ফ্যাশন ডিজাইনের সমস্যা ও সম্ভাবনার ক্ষেত্রগুলো আগাপাশতলা খতিয়ে দেখা এই নিবন্ধের/গবেষণার মূল উদ্দেশ্য। বিভিন্ন পরিবর্তনের ভেতর দিয়ে প্রবাহিত হয়ে বাংলাদেশের তাঁতশিল্পের বর্তমান অবস্থা এখন ঠিক কি? ঐতিহ্যবাহী পদ্ধতির পাশাপাশি বিভিন্ন প্রযুক্তিগত উন্নয়নের কতটা প্রভাব পড়েছে তাঁতবস্ত্রের মান ও উৎপাদনের পরিমানের উপর? পরিবর্তনের এই ধারা কতটা প্রভাবিত করেছে উৎপাদক ও ভোক্তা–এই দুই পক্ষকে? উনিশ শতক পর্যন্ত বাংলাদেশ থেকে রপ্তানি হতো বিভিন্ন ধরনের কাপড়–তৈরি পোষাক নয়। কিন্তু বিশ শতকের শেষ দিকে শুরু হয়ে তৈরি পোশাক রপ্তানিতে বাংলাদেশ এখন পৃথিবীতে অত্যন্ত প্রসিদ্ধ। এই পরিবর্তনের কারণগুলো ঠিক কি কি? বাংলাদেশের তাঁতশিল্প ও ফ্যাশন ইন্ডাস্ট্রিতে কি প্রভাব পড়েছে এই পরিবর্তনের? গত দুই দশকে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে ফ্যাশন ডিজাইন বিষয়টি পাঠ্য হয়েছে। কি শেখানো হয় এইসব ফ্যাশন ডিজাইন বিভাগে? আর বাংলাদেশের ফ্যাশন ইন্ডাস্ট্রিতে কি প্রভাব পড়েছে এইসব বিভাগের কার্যক্রমের? এইসব বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যসূচিতে কি বাংলাদেশের তাঁতশিল্প সম্পর্কে সঠিক শিক্ষা লাভের সুযোগ আছে? নাকি পশ্চিমা অনুকরণে গড়ে উঠেছে এসব বিভাগের পাঠ্যসূচি? বাংলাদেশের ফ্যাশন ইন্ডাস্ট্রি কি আন্তর্জাতিক বাজারে প্রতিযোগিতায় টিকতে পারছে? বাংলাদেশে কি আন্তর্জাতিক মানের কোন ফ্যাশন ডিজাইনার আছে? এই ধরনের অজস্র প্রশ্নের উত্তর সন্ধানের চেষ্টা করা হবে নিবন্ধে।

শুধু তাই নয়–বর্তমান প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশের তাঁতশিল্প ও ফ্যাশন ইন্ডাস্ট্রির বিভিন্ন সমস্যার নিরিখে সম্ভাব্য সমাধান খোঁজারও চেষ্টা করা হবে এই লেখায়। তবে সবার আগে বুঝে নেয়া দরকার বাংলাদেশের তাঁতশিল্পের সোনালী অতীতের যোগসূত্র বা পরম্পরা কতটা বহমান আছে? এখানে প্রথমে বাংলাদেশের তাঁতশিল্পের সাম্প্রতিক হাল-হকিকত ও বিবর্তনের রূপরেখা নিয়ে কিছু আলোচনা করা হবে। আলোচনা হবে সুতা, তাঁতযন্ত্র এবং রঞ্জনপ্রক্রিয়া নিয়ে। কেননা, এই তিনটি হলো দেশের তাঁতশিল্পের অন্যতম স্তম্ভ। পাশাপাশি ফ্যাশনশিল্পের অতীত, বর্তমান ও বিবর্তনের রূপরেখা নিয়েও আলোকপাত করা হবে।

গবেষণার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

একুশ শতকে বাংলাদেশের তাঁতশিল্প ও ফ্যাশন-এই দুই ক্ষেত্রকে কেন্দ্র করে গবেষণা, নীতিনির্ধারণ বা আলোচনার মূল লক্ষ্য হলো ঐতিহ্য ও আধুনিকতার মধ্যকার সম্পর্ককে নতুনভাবে সংজ্ঞায়িত করা এবং তা দেশের অর্থনীতি, সংস্কৃতি ও বৈশ্বিক পরিচয়ে কীভাবে প্রভাব ফেলতে পারে তা অনুধাবন করা। প্রথমত, তাঁতশিল্পের লক্ষ্য হচ্ছে হাজার বছরের বয়ন ঐতিহ্যকে টেকসই উপায়ে সংরক্ষণ, উন্নয়ন ও অর্থনৈতিকভাবে পুনরুজ্জীবিত করা, যাতে তাঁত কারিগররা তাদের পেশায় ফিরে আসতে পারে, ন্যায্য আয় পায় এবং নতুন প্রজন্মের কাছে এই শিল্প আবারও আকর্ষণীয় হয়। একইসঙ্গে, ফ্যাশনশিল্পের লক্ষ্য হলো স্থানীয় কাঁচামাল, নকশা, রংতত্ত্ব ও সাংস্কৃতিক প্রতীকের ব্যবহার করে এমন আধুনিক পোশাক ও স্টাইল তৈরি করা, যা শুধু দেশীয় বাজার নয়, আন্তর্জাতিক বাজারেও বাংলাদেশের নতুন একটি ব্র্যান্ড পরিচয় গড়ে তুলবে। অর্থাৎ, লক্ষ্য একটাই-ঐতিহ্যকে বাজারযোগ্য রূপে উপস্থাপন করে তাঁত ও ফ্যাশন উভয় খাতকে সৃজনশীল অর্থনীতির মূলধারায় নিয়ে আসা। এখানে গবেষণার উদ্দেশ্য শুধু সমস্যার তালিকা তৈরির মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, বরং সমন্বিত কৌশল নিয়ে ভাবা-কীভাবে তাঁতের বুনন, রঙ, নকশা এবং ফ্যাশনের কাটিং, স্টাইলিং, ব্র্যান্ডিং একসঙ্গে কাজ করতে পারে এবং

কীভাবে এই সংযোগ দেশের অর্থনীতি, কর্মসংস্থান, নারীনির্ভর শ্রমবাজার, গ্রামীণ উন্নয়ন ও সাংস্কৃতিক কূটনীতিতে ভূমিকা রাখতে পারে।

দ্বিতীয়ত, এই গবেষণা বা আলোচনার অন্যতম উদ্দেশ্য হলো তাঁতশিল্প ও ফ্যাশন-দুটিকেই একই ফ্রেমে দেখে তাদের পারস্পরিক নির্ভরতা ও সম্ভাবনার দিকগুলো স্পষ্ট করা। যেমন, তাঁতশিল্পের সবচেয়ে বড় সমস্যা হলো কাঁচামালের মূল্যবৃদ্ধি, ডিজাইনের সীমাবদ্ধতা, যান্ত্রিক উৎপাদনের চাপ ও তরুণ প্রজন্মের পর্যাপ্ত আগ্রহ না থাকা; আর ফ্যাশনশিল্পের সমস্যা হলো বৈশ্বিক প্রতিযোগিতা, পরিবেশবান্ধব উৎপাদনের চাপ এবং ট্রেন্ড-নির্ভর বাজার পরিবর্তন। এই দুই খাতের সমস্যাকে সমন্বিতভাবে না দেখলে পরিকল্পনা কখনোই বাস্তবসম্মত হবে না। তাই উদ্দেশ্য হলো-ফ্যাশন ডিজাইনার, তাঁতকারিগর, উদ্যোক্তা, গবেষক, নীতিনির্ধারক ও আন্তর্জাতিক ক্রেতা-সব পক্ষকে একই আলোচনামঞ্চে আনা, যাতে তাঁতের ঐতিহ্য প্রযুক্তি-নির্ভর ফ্যাশনের সঙ্গে যুক্ত হয় এবং ফ্যাশনশিল্প দেশীয় কাঁচামাল ও জাতীয় সংস্কৃতির ভিত্তিতে দাঁড়ায়। একইসঙ্গে এই আলোচনার উদ্দেশ্য হলো "Made in Bangladesh"-কে নতুন অর্থ দেওয়া-শুধু রপ্তানি পোশাক নয়, বরং "সৃজনশীল ঐতিহ্যনির্ভর ফ্যাশন ব্র্যান্ড" হিসেবে বাংলাদেশের পরিচিতি গড়া। শেষ পর্যন্ত, লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য দুটোই একটি সুস্পষ্ট বাস্তবতায় এসে দাঁড়ায়-তাঁতশিল্পকে বাঁচাতে ফ্যাশনের দরকার, আর ফ্যাশনের আত্মপরিচয় গঠনে দরকার তাঁতের শিকড়। অর্থাৎ, তাঁতশিল্প ও ফ্যাশনশিল্প আলাদা দুটি খাত নয়, বরং একই সাংস্কৃতিক অর্থনীতির দুই সৃজনশীল শক্তি, যাদের সমন্বয়েই একুশ শতকের বাংলাদেশ বৈশ্বিক বাজারে স্বকীয় পরিচয়ে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পারে।

বাংলাদেশের তাঁতশিল্প : বিবর্তনের রূপরেখা

সুতার সাতকাহন

তাঁতশিল্পের নিরিখে সুতা বা তন্তু হলো এমন একটি উপাদান–যা ছাড়া তাঁতশিল্প কোনভাবে শুরুই হতে পারে না। বলা যেতে পারে, সুতা বা তন্তু হলো তাঁতশিল্পের প্রাণ। মোটাদাগে, সুতা বা তন্তুকে দুইভাগে ভাগ করা যায়। প্রাকৃতিক তন্তু ও কৃত্রিম তন্তু। তবে উৎসগত দিক বিবেচনায় আনলে, সুতাকে মোটামুটি তিনভাগে ভাগ করা যায়। এগুলো হলো :

১. উদ্ভিজ্জ সুতা বা ভেজিটেবল ফাইবার –(যেমন- তুলা, লিনেন ইত্যাদি)। অর্থাৎ যেসব সুতা গাছ থেকে উৎপন্ন হয়।
২. প্রাণিজ সুতা বা অ্যানিম্যাল ফাইবার –(যেমন রেশম, উল ইত্যাদি)। অর্থাৎ যেসব সুতা পশু বা পোকা থেকে উৎপন্ন হয়।
৩. কৃত্রিম সুতা বা আর্টিফিশিয়াল ফাইবার –(যেমন রেয়ন, নাইলন ইত্যাদি)। অর্থাৎ যেসব সুতা পরীক্ষাগারে কৃত্রিম উপায়ে তৈরি করা হয়।

এছাড়াও আরো দুই ধরনের সুতা তৈরি ও ব্যবহার হয়। এগুলো হলো খনিজ সুতা বা মিনারেল ফাইবার (যেমন অ্যাসবেস্টস), যা খনিজ পদার্থ থেকে তৈরি হয়। এবং ধাতব সুতা বা মেটালিক ফাইবার (যেমন সোনালী জরি, রূপালী জরি ইত্যাদি), যা বিভিন্ন ধাতব পদার্থ থেকে তৈরি হয় (বসু, ১৯৬১, পৃ. ২৪০-২৪২; আকন্দ, ২০১৮, পৃ. ৫১)। বস্ত্রবয়নে প্রধানত প্রথম তিনটি শ্রেণির সুতাই বেশি ব্যবহৃত হয়। আর কৃত্রিম সুতার প্রচলন ঘটেছে বিশ শতকের প্রথমার্ধে। এর আগে মানুষ বস্ত্র বয়নের নিমিত্তে প্রয়োজনীয় সুতা সংগ্রহের জন্য উদ্ভিদ বা প্রাণীর উপর নির্ভরশীল ছিল এবং এখনো বেশির ভাগ বস্ত্রবয়ন এগুলো দিয়েই হয়। প্রাগৈতিহাসিককাল থেকে ভারতবর্ষে তুলা বা কার্পাসের চাষ হয়। সিন্ধু সভ্যতায় কর্ষিত কার্পাসের নমুনা পাওয়া গেছে। কার্পাস–একটি অষ্ট্রিক শব্দ। মনে করা হয় অষ্ট্রিক ভাষী জনের মাধ্যমেই বাংলাদেশে তুলার চাষ প্রচলিত হয়েছে। তবে নির্দিষ্ট করে, ঠিক কখন

থেকে তুলার চাষ শুরু হয়েছে–তা বলা মুশকিল। তবে তা যে খ্রিস্টপূর্ব পঞ্চম শতকের আগে, সেটা অনুমান করা যায়, গ্রীক ঐতিহাসিক হেরোডোটাসের লেখা থেকে। খ্রিস্টপূর্ব ৪২৫ অব্দে হেরোডোটাস ভারতের তুলা বা কার্পাস সম্পর্কে অবগত ছিলেন (আকন্দ, ২০১৮, পৃ. ৫১)।

প্রাচীনকাল থেকে, বিশেষ করে বাংলাদেশের মসলিনবস্ত্রের খ্যাতি ছিল ব্যাপক। আর এই খ্যাতির পেছনে অন্যতম ভূমিকা ছিল এই অঞ্চলে উৎপাদিত কার্পাসের। এই কার্পাস পরিচিত ছিল 'ফুটি কার্পাস' হিসেবে। বিখ্যাত উদ্ভিদ বিজ্ঞানী উইলিয়াম রকসবার্গ একে Gossypium Herbaceum শ্রেণিভুক্ত বলে বর্ণনা করেছেন (টেলর, ১৮৪০, পৃ, ৬৩; আকন্দ, ২০১৮, পৃ. ৫২)। ঢাকার বিখ্যাত সূক্ষ্ম মসলিন কাপড়ের জন্য প্রয়োজন ছিল সূক্ষ্ম সুতা। ফুটি কার্পাস থেকে মসলিনের উপযোগি সূক্ষ্ম সুতা হাতে কাটা হতো।

প্রধানত দুই ধরণের কার্পাসের চাষ হতো বাংলাদেশে। এগুলো ফুটি কার্পাস ও বয়রাতি কার্পাস নামে পরিচিত ছিল। এছাড়াও বাংলাদেশের আরো যেসব তুলা বা কার্পাস চাষ হতো সেগুলি বিভিন্ন নামে পরিচিত ছিল। যেমন নুরমা, শেরাজ, বঙ্গা, বয়া বঙ্গা, মুহরী, বড়াইলি, কাওর, দেশি ইত্যাদি। বাংলাদেশের বিভিন্ন তুলা উৎপাদন অঞ্চল সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণ দিয়েছেন হামিদা হোসেন তার বিখ্যাত "The Company Weavers of Bengal: The East India Company and the Organisation of Textile Production in Bengal 1757-1813" গ্রন্থে। এছাড়া দেবেন্দ্র বিজয় মিত্রের "The Cotton Weavers of Bengal 1757-1833" থেকেও আমরা অবিভক্ত বাংলার তুলা উৎপাদন কেন্দ্রগুলো এবং তাদের মান ও ব্যবহার সম্পর্কে জানতে পারি (আকন্দ, ২০১৮, পৃ. ৫২)।

সেখানে দেখা যাচ্ছে বিভিন্ন ধরনের কার্পাস দিয়ে মসলিন হতো। তবে উৎকৃষ্ট মসলিনের জন্য ফুটি কার্পাসই ব্যবহৃত হতো। ঢাকা জেলার প্রধান কৃষিজ দ্রব্য ছিল কার্পাস। তবে ফুটি কার্পাসের জন্য মেঘনা, শীতলক্ষা ও ব্রক্ষপুত্র–এই তিন নদীর মধ্যবর্তী অঞ্চল ছিল সেরা। বিশেষ করে মেঘনা নদীর পশ্চিম তীরের ৪০ মাইল দৈর্ঘ্য এবং ৩ মাইল প্রস্থের ভূভাগে কার্পাস ভালো জন্মাত। জন টেলরের বিবরণ থেকে জানা যায় কেদারপুর, বিক্রমপুর, রাজানগর, কার্তিকপুর, শ্রীরামপুর ও ইদিলপুর নামক পরগণা কার্পাস উৎপাদনের জন্য বিখ্যাত ছিল। তাঁর মতে, এই এলাকায় উৎপাদিত ফুটি কার্পাস পৃথিবীর যেকোন দেশের কার্পাসের চেয়ে শ্রেষ্ঠ ছিল (করিম, ১৯৬৫, পৃ. ১৮-১৯)। এছাড়া শীতলক্ষ্যা নদীর তীরবর্তী রূপগঞ্জ থানার ১৬ মাইল দীর্ঘ ভূভাগেও ভালো কার্পাস জন্মাতো। আবার, জেমস টেলর অনুমান করেছেন যে, 'কার্পাস' নামটি 'কাপাসিয়া' নামক স্থান থেকে উৎপত্তি হতে পারে (টেলর, ১৮৪০, পৃ. ৮৪)। ফলে ঢাকা এবং পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে যে উন্নতমানের কার্পাস চাষ হতো তাতে কোন সন্দেহ নেই। এসব তুলা থেকে টাকু কিংবা চরকার সাহায্যে সুতা কেটে তা এদেশের তাঁতশিল্পে ব্যবহার করা হতো। জেমস টেলর স্পষ্টতই বলেছেন যে, 'সকল উৎকৃষ্ট মসলিনই এ জেলায় উৎপন্ন দেশী সুতায় তৈরি' (টেলর, ১৮৪০, পৃ. ৮৫)।

ফুটি কার্পাস এবং ফুটি থেকে উৎপাদিত মসলিন

সাধারণত চরকায় এবং টাকুতে তুলা থেকে এসব সুতা হাতে কাটা হতো। সুতা কাটার কাজটা সাধারণত মেয়েরাই করতো। সূক্ষ্ম ও মিহি সুতা কাটার জন্য প্রখর দৃষ্টিশক্তি ও হাতের আঙুলের প্রখর চেতনা শক্তির প্রয়োজন হতো। একারণে খুব কম বয়সী বা বেশি বয়সী মেয়েরা এই

কাজের উপযুক্ত বিবেচিত হতো না। জেমস টেলরের মতে, ১৮ থেকে ৩০ বছর বয়সের হিন্দু মেয়েরা শ্রেষ্ঠ সুতা কাটুনি ছিল। ৩০ এর পরে মেয়েদের দক্ষতা হ্রাস পায় এবং ৪০ এর পরে তাদের দৃষ্টি শক্তি নিদারুণ দুর্বল হয়ে পড়ে বলে তাদের পক্ষে আর সূক্ষ্ম সুতা কাটা সম্ভব হতো না বলেও তিনি জানিয়েছেন (টেলর, ১৮৪০, পৃ. ৮৬; আকন্দ, ২০১৮, পৃ. ৫৪)। টেলরের মতে, 'সবচেয়ে উৎকৃষ্ট মানের সুতা হলো ২৫০ নম্বর, যা দিয়ে সেখানে এযাবৎ মসলিন তৈরি হয়েছে এবং এর এক পাউন্ড তুলার সুতার দৈর্ঘ্য সাড়ে ১১৯ মাইল' (টেলর, ১৮৪০, পৃ. ৮৭)। উনিশ শতকের মাঝামাঝি টেলর যখন একথা বলছেন তখন অবশ্য ইংল্যান্ডের মেশিনে সূক্ষ্ম সুতা তৈরি শুরু হয়ে গেছে। সেগুলো ঢাকাতেও এসেছে। সেসম্পর্কে টেলরের মন্তব্য, 'ঢাকায় ২৫০ নম্বর সুতা আমদানি করা হয়েছে এবং তা দিয়ে মসলিনও তৈরি করা হয়েছে। কিন্তু এদেশীয় উৎকৃষ্ট মানের সুতার কাছে তা দাঁড়াতেই পারে না (টেলর, ১৮৪০, পৃ. ৮৭)। ১৮৫১ সালে লন্ডনের প্রদর্শনীতে বাংলাদেশের হাতে কাটা সুতা প্রদর্শিত হয়েছিল এবং অভিজ্ঞ বিচারকদের দ্বারা এই সুতা অত্যন্ত সূক্ষ্ম ও সমপরিমাণে মসৃণ বলে স্বীকৃত হয়েছিল। বেইনস জানাচ্ছেন, চার্লস উইলকিন্স কর্তৃক সংগৃহিত মসলিনের সূক্ষ্ম সুতা ইন্ডিয়া হাউজ মিউজিয়ামে সংরক্ষিত আছে। এখানে প্রতি পাউন্ড তুলায় ১১৫ মাইল ২ ফার্লং ৬৬ গজ সুতা রয়েছে। এটি ছিল ৩৫০ নম্বরের সুতা (টেলর, ১৮৪০, পৃ. ৮৭)।

উনিশ শতকের মাঝামাঝি থেকে মসলিন বস্ত্রের রপ্তানি ও উৎপাদন কমে গেলে সূক্ষ্ম সুতা উৎপাদনের পরিমানও আশংকাজনকভাবে কমে যায়। বিলেতের মিলের সুতায় এবং মিলে তৈরি সুতার বস্ত্রে বাংলাদেশ ভরে উঠে। তারপরও উনিশ শতকে কিছু কিছু মসলিন তৈরির খবর পাওয়া যায়। এমন কী উনিশ শতকের শেষ দশকেও মানিকগঞ্জে এমন দুজন বেঁচে ছিলেন যারা একসময় মসলিনের উপযোগী মিহি সুতা কাটতেন (আকন্দ, ২০১৮, পৃ. ৫৫)। তবে ততদিনে ঢাকার বিখ্যাত ফুটি কার্পাস বিলুপ্ত হয়ে গেছে। মোটামুটি এর পর তুলা বা হাতে কাটা সুতা সম্পর্কে আর তেমন কোন খবর পাওয়া যায় না।

বর্তমানে মূলত মিলের তৈরি সুতায় নানা ধরনের তাঁতবস্ত্র তৈরি হয়। সুতি সুতার পাশাপাশি রেশমি সুতা ব্যবহারের প্রচলন আছে। এছাড়া তাঁতিরা অনেক সময় বেশি লাভের আশায় রেশমি সুতার বদলে নাইলন ব্যবহার করে থাকে। সম্প্রতি পশ্চিমবাংলা থেকে আমদানি করা অম্বর চরকায় কাটা ২০০ বা ২৫০ কাউন্টের খাদি সুতায় কিছু কিছু জামদানি তৈরি হচ্ছে। তবে এই পরিমাণ খুবই কম। ফুটি কার্পাস উৎপাদনে এবং এই তুলা থেকে মিহি সুতা কাটার জন্য সরকারী সংস্থা–বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড এবং বাংলাদেশ তুলা উন্নয়ণ বোর্ড– কিছু উদ্যোগ নিয়েছে এবং এই উদ্যোগ অনেকটা সফলও হয়েছে। তবে 'ফুটি কার্পাস' তুলা উৎপাদন, তা থেকে চরকায় হাতে কাটা সূক্ষ্ম সুতা তৈরি এবং সেই সুতা দিয়ে মিহি বস্ত্র উৎপাদন এখনো পরীক্ষামূলক পর্যায়ে রয়েছে–ব্যাপক অর্থে উৎপাদন শুরু হয়নি।

বৃটিশ ভারতে সুতা কাটছেন হিন্দু নারীগণ

বাংলাদেশে সুতার সবচেয়ে বড় বাজার হলো নারায়ণগঞ্জ। স্পিনিং মিলে উৎপাদিত সুতা নারায়ণগঞ্জে পৌছায় সেখান থেকে বিভিন্ন অঞ্চলের সুতা ব্যবসায়ীরা সুতা সংগ্রহ করে। বাংলাদেশের সমস্ত তাঁত এলাকায় বেশ কিছু সুতার ব্যবসায়ী আছে। তারা সবাই নারায়ণগঞ্জ থেকে সুতা সংগ্রহ করে থাকে। তাদের মাধ্যমে এটা স্থানীয় তাঁতিদের কাছে পৌঁছে যায়। তাঁতশিল্পে সাধারণত ৪০, ৬০ এবং ৮০ নম্বরের সুতা বেশি ব্যবহৃত হয়। স্থানীয়

বাজারে বিভিন্ন রঙের সুতা যথেষ্ঠ পরিমাণে পাওয়া যায়। তবে সম্প্রতি ১০০ বা ১২০ কাউন্টের মিলের সুতা দিয়েও কিছু কিছু বস্ত্র তৈরি হয়। তবে এর পরিমাণ খুব কম।

তাঁতযন্ত্রের বিবর্তন

খুব সম্ভবত সুপ্রাচীনকাল থেকে বাংলাদেশ ভূখন্ডে, বিশেষ করে সমতলভূমিতে, সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত ও প্রচলিত তাঁতযন্ত্র হলো গর্ত তাঁত। গর্ত তাঁত ছাড়া অন্যান্য তাঁত অর্থাৎ কোমর তাঁত, ভূমিতে সমান্তরাল তাঁত ও উলম্বণ বা খাড়া তাঁতের ব্যবহার বাংলাদেশে অপেক্ষাকৃত কম। এবার প্রধান তাঁতযন্ত্রগুলো সম্পর্কে আলোচনা করা যাক।

গর্ত তাঁত

আদিকাল থেকে সম্ভবত ভারত উপমহাদেশের প্রেক্ষাপটে সবচেয়ে প্রাচীন ও প্রচলিত তাঁত হলো গর্ত তাঁত। এটি বাংলাদেশেরও অন্যতম প্রাচীন তাঁত। এই ধরণের তাঁতে মাকু হাতে ছুঁড়ে বস্ত্র বয়ন করা হয়। মাকু হাতে ছুঁড়ে কাজ করা হয় বলে এই ধরণের তাঁতের নাম 'থ্রো সাটল লুম'। এই তাঁতের নির্মাণ খরচ খুবই কম। সাধারণ বাঁশ-কাঠ ইত্যাদি দিয়েই এই তাঁত তৈরি করা যায়। মিহি সুতার কাজের জন্য এই তাঁত খুবই উপযোগি। কিন্তু বোধগম্য কারণেই এই তাঁতে উৎপাদনের পরিমাণ অত্যন্ত কম হয়। তাছাড়া এতে বেশি বহরের কাপড় বোনা কষ্টসাধ্য।

এই ধরণের তাঁতের প্রচলন বাংলাদেশে এখন অত্যন্ত কম। তবে উনিশ শতক পর্যন্ত এই ধরণের তাঁতের সংখ্যাই বাংলাদেশে বেশি ছিল। উল্লেখ্য, কিংবদন্তির ঢাকাই মসলিন এই সনাতনী গর্ত তাঁতেই তৈরি হতো। এখনো ঢাকাই জামদানি এই হাতে মাকু ছোঁড়া গর্ত তাঁতে তৈরি হয়ে থাকে। বর্তমানে জামদানি ছাড়াও কোথাও কোথাও গামছা, লুঙ্গি ইত্যাদি তৈরি করা হয় সনাতনী গর্ত তাঁত ব্যবহার করে। তবে এর পরিমান এখন খুবই সামান্য। বর্তমানে বাংলাদেশে তুলনামূলক বেশি ব্যবহৃত হয় ঠকঠকি তাঁত বা ফ্লাই সাটল লুম, চিত্তরঞ্জন তাঁত ও পাওয়ার লুম। নিচে এগুলো সম্পর্কে কিছু আলোচনা করা হলো :

ঠকঠকি তাঁত

১৭৩৩ সালে জন কী (John Key) নামে একজন ইউরোপীয় ব্যক্তি, দক্তি (Sley) এবং তার দুইপাশে দুইটা বাক্স (Shuttle Box) প্রস্তুত করে তাতে মেড়া (Picker) বসিয়ে একটি হাতল ও দড়ির সাহায্যে এক দিক হতে অন্য দিকে খুব দ্রুতবেগে মাকু চলাচলের একটা কৌশল আবিষ্কার করেন (বসু, ১৯৬১, পৃ. ১; আকন্দ, ২০১৮, পৃ. ১১২)। এভাবে হাতে ছোঁড়ার চেয়ে আরো দ্রুত বেগে মাকু চলাচল সম্ভব হয় এবং কম সময়ে অধিক বস্ত্র বয়ন সম্ভব হয়। এই নতুন ধরণের তাঁতকে বলা হয় ফ্লাই সাটল লুম। আঠারো শতকে ইউরোপে এটা আবিস্কৃত ও প্রচলিত হলেও বাংলাদেশে এর প্রচলন ঘটেছে আরো অনেক পরে।

সম্ভবত ডেনিসদের মাধ্যমে ফ্লাই সাটল লুমের প্রচলন ঘটেছিল বাংলাদেশে এবং সেটা প্রথমে ঘটেছিল শ্রীরামপুরে। উল্লেখ্য, শ্রীরামপুর ছিল ডেনিস উপনিবেশ। ফ্লাই সাটল লুম সম্পর্কে ত্রৈলোক্যনাথ বসু লিখেছেন, 'হুগলী জেলার অন্তর্গত শ্রীরামপুরে যখন ডেনিশরা বাস করতেন, সেই সময় জনৈক ডেনিশ উক্ত নবোন্নত প্রণালীর একখানা তাঁত তথায় আনয়ন করেন এবং একমাত্র সেই তাঁত অনুকরণ করিয়া শ্রীরামপুরের তন্তুবায়দের মধ্যে সর্ব্বপ্রথম এই তাঁতের প্রচলন হয়। তারপর এইরূপ তাঁত শ্রীরামপুর হইতে ক্রমে ক্রমে বাংলার প্রায় সর্ব্বত্রই বিস্তৃত হইয়া পড়ে। সেই কারণে উক্ত তাঁত বাংলাদেশে এখনও শ্রীরামপুরী ফ্লাই সাটল লুম নামে পরিচিত এবং ইহাকেই বলে ঠকঠকি তাঁত' (বসু, ১৯৬১, পৃ. ১; আকন্দ, ২০১৮, পৃ. ১১২)। তবে সেটা ঠিক কবে থেকে– তা দিন তারিখ নির্দিষ্ট

করে বলা মুশকিল। তবে বিভিন্ন তথ্য-প্রমাণ ও আলামত দেখে মনে হয় এটা উনিশ শতকের কোন একসময় ঘটেছিল।

উনিশ শতকের শেষদিকে এবং বিশ শতকের শুরুতে সরকারী বিভিন্ন প্রতিবেদনে আমরা সনাতন তাঁতের চেয়ে উন্নত ঠকঠকি তাঁতের প্রচলনের পক্ষে নানা সুপারিশ করা হয়েছে দেখতে পাই। এর ফল স্বরূপ ১৯০৮ সালে শ্রীরামপুরে একটি বয়ন বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। যার নাম ছিল Serampore Weaving Institute (আকন্দ, ২০১৮, পৃ. ১১৩)। বাংলাদেশের তাঁতশিল্পের ইতিহাসে এই বয়ন বিদ্যালয়টির বিশেষ ভূমিকা আছে। বয়ন বিষয়ক নানারকম আধুনিক কৃৎকৌশল প্রচলন ও নানারকম পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার মাধ্যমে বাংলাদেশের বয়নশিল্পের উন্নতি ঘটানো ছিল এই বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার মূল লক্ষ্য। শ্রীরামপুর বয়ন বিদ্যালয় ও অন্যান্য ভ্রাম্যমান ও স্থায়ী বয়ন বিদ্যালয়ের সুবাদে ঠকঠকি তাঁত মোটামুটি ১৯২০-৩০এর মধ্যে বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়েছিল (আকন্দ, ২০১৮, পৃ. ১১৩)।

ফ্লাই সাটল লুমে মাকু চলাচলের সময় এক ধরনের 'ঠক ঠক' শব্দ হয়। যেকারণে বাংলাদেশে ফ্লাই সাটল লুম 'ঠকঠকি তাঁত' নামে পরিচিতি পায়। গর্ত তাঁতে ফ্লাই সাটল বা উড়ন্ত মাকু ব্যবহার করা যায়। একে বলা হয় ঠকঠকি গর্ত তাঁত। এতে হাতে ছোঁড়া মাকুর তুলনায় বয়নের গতি দ্রুততর হয় এবং বস্ত্র উৎপাদনের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। আর তাছাড়া মাটির মেঝে ঠান্ডা থাকে বলে গর্ত তাঁতে সুতা তুলনামূলক নরম থাকে, কড়া হতে পারে না এবং সুতা কম ছেঁড়ে। তাছাড়া এই ধরনের তাঁতে কাপড়ের টেক্সচার ভালো হয়। মিহি সুতার তাঁতিরা তাই এখনও ঠকঠকি গর্ত তাঁতই ব্যবহার করতে পছন্দ করে।

ফ্রেম তাঁত

ফ্রেম তাঁতের করণকৌশল গর্ত তাঁতের অনুরূপ; তবে এটা কোন গর্ত নয়, একটা ফ্রেমের উপর বসানো হয় বলে এটাকে ফ্রেম তাঁত বলা হয়। শ্রীরামপুরেই এই তাঁতের সূত্রপাত হয় প্রথম (ব্যানার্জী, ১৮৯৮, ৪৮-৪৯; আকন্দ, ২০১৮, পৃ. ১১৪)। পরে, সেখান থেকে এটা দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে। গর্ত তাঁত স্থানান্তর করার কোন সুযোগ থাকে না। কিন্তু ফ্রেম তাঁতের সুবিধা এই যে, এটা সহজেই স্থানান্তর করা যায়। মূলত চারটি পায়ার উপরে ফ্রেম তাঁত বসানো হয়। বাংলাদেশে এখন ব্যাপক মাত্রায় ফ্রেম তাঁত ব্যবহৃত হচ্ছে। তাঁতিদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, মিহি সুতার কাপড় বুনতে তারা গর্ত তাঁত পছন্দ করে। আর অধিক মাত্রায় উৎপাদনের জন্য এবং অপেক্ষাকৃত মোটা কাপড় বুনতে তারা ফ্রেম তাঁত পছন্দ করে। অধিক সংখ্যক ঝাঁপে নানাপ্রকার ডিজাইনের কাপড় বুনতে তাঁতিরা গর্ত তাঁতের চেয়ে ফ্রেম তাঁত বেশি পছন্দ করে।

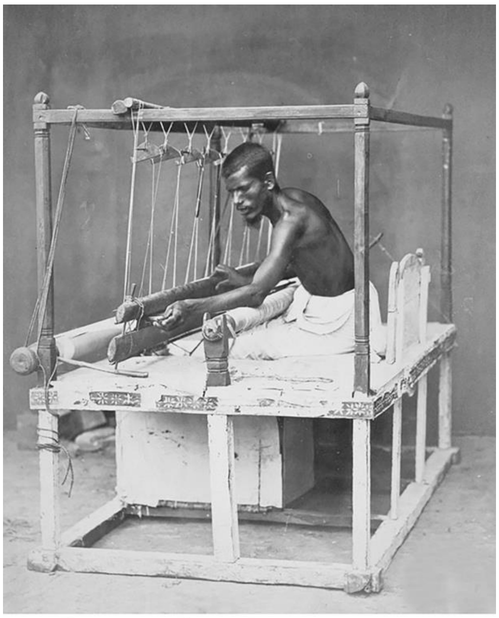

সিল্কের তাঁত চালনারত তাঁতি, ঘোটাল, মেদিনিপুর, বেঙ্গল-১৮৭৩। সৌজন্যে: ইন্ডিয়া মিউজিয়াম

চিত্তরঞ্জন তাঁত

মূলত লোহা এবং কাঠ দ্বারা নির্মিত চিত্তরঞ্জন বা জাপানী তাঁতকে সেমি অটোমেটিক তাঁত বলা যেতে পারে। এই তাঁতের বয়ন প্রক্রিয়া অন্যান্য সাধারণ তাঁতের মতোই। তবে পার্থক্য এই যে, চিত্তরঞ্জন তাঁতে কাপড় বোনার সময় টানা-ছাড়া (Let off) এবং কাপড় জড়ানোর (Take off) কাজ একসাথে হতে থাকে। অর্থাৎ বাইরের নরদের টানা সুতা স্বয়ংক্রিয়ভাবে প্রয়োজনমতো ছাড়তে থাকে এবং বোনা কাপড় কোল নরদের সাথে জড়াতে থাকে। এর জন্য আলাদা করে তাঁতিকে কিছু করতে হয় না। সাধারণ তাঁতে (ফ্রেম তাঁতে বা গর্ত তাঁতে) এই কাজটি করতে হয় তাঁতিকে নিজে হাতে। চিত্তরঞ্জন তাঁতের এটাই সুবিধার দিক। যে কোন ধরনের মোটা বা মিহি কাপড় এই তাঁতে অধিক পরিমাণ বয়ন করা যায়। বাংলাদেশে এই চিত্তরঞ্জন তাঁতই 'জাপানী তাঁত' নামে পরিচিত। এই তাঁতের উদ্ভব ঘটেছে শ্রীরামপুরে। এবং সেখান থেকে এটা বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে পড়েছে। বাংলাদেশে হস্তচালিত তাঁতের মধ্যে চিত্তরঞ্জন তাঁত বিশেষ জনপ্রিয়। বাংলাদেশে চিত্তরঞ্জন তাঁতের সূত্রপাত হয়েছে মোটামুটি দেশভাগের কিছু আগে/পরে থেকে। এই তাঁতের নির্মাণ ব্যয় গর্ত তাঁত বা ফ্রেম তাঁতের চেয়ে অপেক্ষাকৃত বেশি। তবে উৎপাদনের পরিমাণও অন্যান্য তাঁতের চেয়ে বেশি বলে ক্রমশ এটা জনপ্রিয় হয়েছে।

পাওয়ার লুম

কারেন্টের তাঁত বা পাওয়ার লুমের উদ্ভব ও প্রচলন ঘটেছে ইউরোপে। শুরুতে এটা জলীয় বাষ্পের শক্তি বা ষ্টিম ইঞ্জিন দিয়ে চালানো হতো। পরে বিদ্যুৎ ব্যবহার শুরু হয়। এটিকে স্বয়ংক্রিয় তাঁত বলা যেতে পারে। এই তাঁতের বিশেষ বৈশিষ্ট্য এই যে, এটা চালাতে প্রতিটি তাঁতের জন্য একজন বা দুইজন ব্যক্তি লাগে না। একজন ব্যক্তিই একাধিক তাঁত চালাতে পারে। মূলত বিদ্যুতের শক্তিতে স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতিতে এটা চালিত হয়। তবে কারেন্টের তাঁতে একজন পর্যবেক্ষক তাঁতি থাকে– যার অধীনে একাধিক তাঁতে একই সঙ্গে কাজ চলতে পারে। তিনি প্রয়োজনে বা কোন সমস্যা হলে তা সমাধান করে দেন এবং যথাযথভাবে বয়নকাজ পরিচালনা করতে সাহায্য করেন। এই তাঁতে উৎপাদনের পরিমাণ হাতে চালিত যেকোন তাঁতের চেয়ে বেশি। তবে এই তাঁতে খুব সূক্ষ্ম সুতায় কাজ করা মুশকিল। সাধারণ মানের কাপড়ের জন্য এই তাঁত বহুল ব্যবহৃত হয়। এই তাঁতের একটা অসুবিধা এই যে, তা বিদ্যুতের উপর ভীষণভাবে নির্ভরশীল। বিদ্যুৎ না থাকলে এই তাঁতে কাপড় বোনা সম্ভব নয়। তাছাড়া এই তাঁতে অন্যান্য তাঁতের চেয়ে অনেক বেশি শব্দদুষণও ঘটে। তারপরও উৎপাদনের পরিমান বেশি হওয়ায় ক্রমশ এই তাঁতের চাহিদা বাড়ছে। বাংলাদেশে কারেন্টের তাঁত বা পাওয়ার লুমের প্রচলন ঘটেছে মূলত বিশ শতকের প্রথমার্ধ থেকে। তবে পাকিস্তানপর্বে বাংলাদেশে পাওয়ার লুমের ব্যবহার বৃদ্ধি পেয়েছে। বাংলাদেশ স্বাধীন হবার পর পাওয়ার লুমের ব্যাপক প্রসার হয়েছে। বর্তমানে পাওয়ার লুমে বিপুল পরিমানে বস্ত্র উৎপাদিত হচ্ছে।

তবে এই পর্যায়ে ডবি ও জ্যাকার্ডবিষয়ক কিছু আলোচনা করা যেতে পারে। ডবি (Dobby) এবং জ্যাকার্ড (Jacquard) হলো তাঁতের কাজে বয়নের সময়ই নকশা তোলার যান্ত্রিক পদ্ধতি। স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতিতে নকশা তোলার কাজটিকে সহজ করে ফেলা হয়েছে ডবি ও জ্যাকার্ড মেশিন আবিষ্কার ও ব্যবহারের মাধ্যমে। বলাই বাহুল্য, এই দুটি আবিষ্কারও বাংলাদেশে হয়নি, হয়েছে সুদুর ইউরোপে, ১৮০১ সালে। জ্যাকার্ড মেশিনের আবিষ্কর্তা একজন ফরাসী–তার নাম ছিলো জোসেফ মারে জ্যাকার্ড (Joseph Marie Jacquard)। তার নাম অনুসারে এই মেশিনের নামকরণ করা হয়েছে 'জ্যাকার্ড মেশিন' ।

ইউরোপ থেকে কালক্রমে এটা বাংলাদেশে চলে এসেছে। ঠিক কিভাবে এবং কখন এই সব প্রযুক্তি বাংলাদেশে প্রচলিত হয়েছে– তা স্পষ্ট করে বলা মুশকিল। তবে মোটামুটি বিশ শতকের বিশ ও

ত্রিশের দশক থেকে (কিংবা তার কিছু আগে থেকে) এটা বাংলাদেশে ছড়িয়ে পড়েছে বলে জানা যায়। এই বক্তব্যের সমর্থনে বঙ্গীয় শিল্প বিভাগের ভূমিকার কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। কেননা মোটামুটি বিশের দশক থেকেই বঙ্গীয় শিল্প বিভাগের নানারকম উদ্যোগের কথা জানা যায়। বিশেষ করে বঙ্গীয় শিল্প বিভাগের শ্রীরামপুর বয়ন বিদ্যালয়সহ দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে প্রতিষ্ঠিত ভ্রাম্যমান বা স্থায়ী বয়ন বিদ্যালয়গুলো এবিষয়ে বিশেষ ভূমিকা রেখেছে। এভাবেও ডবি বা জ্যাকার্ড পদ্ধতি বাংলাদেশে ছড়িয়ে পড়তে পারে। মোটামুটি বিশ শতকের ত্রিশের দশক থেকে (কিংবা তার আগেই) বাংলাদেশে কিছু ডবি ও জ্যাকার্ড মেশিন চালু হয়েছিল বলে মনে হয়। লিখিত বিবরণের পাশাপাশি বিভিন্ন এলাকার কথ্য ইতিহাসও এই বক্তব্য সমর্থন করে (আকন্দ, ২০১৮, পৃ. ১১৭)।

সাধারণত ছোট ও সরল ধরণের নকশা করার কাজে ডবি ব্যবহার করা হয়। আর জটিল ও বিচিত্র নকশার জন্য জ্যাকার্ড মেশিন ব্যবহার করা হয়। এদুটির মধ্যে করণকৌশলগত পার্থক্য আছে। ডবি সাধারণত দুই প্রকার হয়। দেশি ডবি ও বিলেতি ডবি। দেশি ডবি বলতে বোঝায় কাঠের তৈরি ডাঙ্গি বিশিষ্ট ডবি। এধরনের তাঁতকে ডাঙ্গি তাঁতও বলা হয়। এই ধরনের ডবিতে শুধু একই রকমের নকশা করা সম্ভব। যেমন একসময় শান্তিপুর অঞ্চলে এই ধরনের ডবি ব্যবহার করে শাড়ির পাড়ে ছোট ছোট নকশা করার খুবই প্রচলন ছিল।

ডবি ছাড়াও জ্যাকার্ড মেশিনের সাহায্যে নকশা বোনা সম্ভব। জ্যাকার্ড মেশিন বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে 'মালা', 'জ্যাকেট', 'চেইন' ইত্যাদি নামে পরিচিত। জ্যাকার্ড তাঁতের জন্য যারা নকশা তৈরি করে তারা 'ডিজাইনার' হিসেবে পরিচিত। তাঁত সমৃদ্ধ এলাকায় ডিজাইনার ও জ্যাকার্ড প্রস্তুতকারক এই দুই পেশাজীবীরই সন্ধান পাওয়া যায়। তবে এই দুই পেশাজীবী ছাড়াও আরেক ধরনের পেশাজীবী আছে – যাদেরকে 'জ্যাকার্ড মাস্টার' বলা হয় (স্থানীয়ভাবে 'জ্যাকেট মাস্টার' নামে পরিচিত)। এরা যেমন অনেকে নিজেরা ডিজাইন আঁকতে পারে, তেমনি নিজেরা অনেক সময় মালা বা জ্যাকার্ড তৈরি করে। তবে এদের মূল কাজ হলো মালা বা জ্যাকার্ডটিকে তাঁতে বস্ত্র বয়নের উপযোগী করে প্রস্তুত করে দেয়া এবং বস্ত্র বয়নে কোন সমস্যা হলে তা সমাধান করা। জ্যাকার্ড তাঁতে এই 'জ্যাকেট মাস্টারদের' ভূমিকা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। কেননা তাদের উপরেই নির্ভর করে নকশার বুনন কেমন হবে এবং কীভাবে তা করা হবে। জ্যাকার্ড মাস্টার সব কিছু প্রস্তুত করে দিলে কারিগর বা তাঁতি মাকু চালিয়ে বস্ত্রবয়ন করে। ডিজাইনের ক্ষেত্রে বয়নকারীর তেমন কিছু করার থাকে না। ডিজাইনের ভালো-মন্দ, বুননের কৃৎকৌশলের সুবিধা-অসুবিধা নির্ভর করে জ্যাকার্ড মাস্টারের উপর।

সাধারণ ফ্লাই সাটলযুক্ত গর্ত তাঁত কিংবা ফ্রেম তাঁত কিংবা চিত্তরঞ্জন তাঁতে প্রয়োজনানুসারে ডবি বা জ্যাকার্ড যুক্ত করে তাঁতের কাজ করা সম্ভব। বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে এখন ডবি ও জ্যাকার্ড মেশিন ব্যবহার করে বস্ত্র বয়নের কাজ চলছে। উৎসগত দিক দিয়ে বিদেশী প্রযুক্তি হলেও বাংলাদেশের তাঁতিরা এই প্রযুক্তি আয়ত্ত্ব করে নিজেদের মতো ডিজাইন করে বাংলাদেশের তাঁতশিল্পের গতি অক্ষুন্ন রেখেছেন। মিরপুরের বেনারসী পল্লীতে ও টাঙ্গাইলে শাড়ির ডিজাইনে ব্যাপকভাবে জ্যাকার্ড মেশিন ব্যবহার করা হয়।

মোটামুটি এই হলো তাঁতযন্ত্র বিবর্তনের রূপরেখা। এবার রঞ্জনশিল্প নিয়ে কিছু আলোচনা করা যাক।

রং নিয়ে কিছু কথা

তাঁতশিল্পের সাথে রঞ্জনশিল্পের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে। রঞ্জনশিল্পকে মোটা দাগে প্রধানত দুইভাগে ভাগ করা যায়। প্রথমত প্রাকৃতিক রঙ (Natural Dyeing), দ্বিতীয়ত কৃত্রিম রঙ (Chemical Dyeing)। প্রাকৃতিক রঞ্জন পদ্ধতিই প্রাচীনতম প্রক্রিয়া। আদিকাল থেকে পৃথিবীতে সর্বত্র প্রাকৃতিক রঙেরই প্রচলন ছিল।

ভারতবর্ষে রঞ্জনশিল্পের প্রাচীনতম নিদর্শন পাওয়া গেছে যথারীতি হরপ্পা-মহেঞ্জোদারো সভ্যতা থেকে। এই সভ্যতার মানুষ বিভিন্ন প্রাকৃতিক উপাদান ব্যবহার করে সুতা বা বস্ত্র রঞ্জন করত–এমন প্রমাণ পাওয়া গেছে প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণার মাধ্যমে। এ বিষয়ে গবেষকদের ভাষ্য, 'There, woven and madder-dyed cotton fragments wrapped round a silver pot had been preserved by the metallic salts that impregnated the cloth. The use of madder dye made fast with a mordant and the presence of dye vats at the site testify to an advanced understanding of the processes of colour fixing on cloth,...'(Gillow and Barnard, 1993, p.41).

বৈদিক সাহিত্যিক সূত্রেও আমরা বস্ত্র রঞ্জনের সংবাদ জানতে পারি। *রামায়ণ* ও *মহাভারত*-এ বিভিন্ন রঙের বস্ত্রের বিবরণ আছে। তবে *অর্থশাস্ত্রে* বস্ত্র রঞ্জন, রঞ্জনের উপাদান, রজকদের মজুরি ইত্যাদি বিষয়ে বেশ কিছু তথ্য পাওয়া যায় (বন্দ্যোপাধ্যায়, ২০০১, পৃ. ৫-৮; আকন্দ, ২০১৮, পৃ. ৮৯-৯০)। ফলে এ কথা বেশ নিশ্চিতভাবেই বলা যায় যে লিখিত ইতিহাসের অনেক আগে থেকেই বাংলাদেশে সুতা ও বস্ত্র বিভিন্ন রঙে রঞ্জিত করার ধারা প্রচলিত ছিল। এই ধারা বিভিন্ন ঘাত-প্রতিঘাত ও পরিবর্তনের ভেতর দিয়ে নিরবচ্ছিন্নভাবে একবিংশ শতক পর্যন্ত প্রবাহিত আছে।

পাল পুঁথিচিত্রগুলোকেই (দশম থেকে দ্বাদশ শতক) বাংলাদেশের বস্ত্র রঞ্জনশিল্পের প্রাচীনতম দৃশ্যগত উপাদান হিসেবে গ্রহণ করা যেতে পারে। পাল পুঁথিচিত্রে আমরা যেসব রঙের বস্ত্র ব্যবহার হতে দেখি, তা থেকে তৎকালীন প্রচলিত রঙ সম্পর্কে একটা ধারণা পাওয়া যায়। এগুলোতে লাল, হলুদ, কমলা, সবুজ, নীল, কালো, গোলাপি, খয়েরি ইত্যাদি রঙের বস্ত্র ব্যবহার করতে দেখা যায়। ফলে এমন অনুমান করা অসংগত হবে না যে সে সময় এই সব রঙের বস্ত্র রঞ্জনের প্রক্রিয়া প্রচলিত ছিল। কিন্তু এসব রঙ কীভাবে বা কী দিয়ে এবং কারা তৈরি করত –সে বিষয়ে তেমন কোনো তথ্য জানা যায় না।

আসলে আদিকাল থেকেই বাংলাদেশে বিভিন্ন ধরনের গাছ-গাছড়ার ছাল-বাকল, ফুল, লতা, পাতা, বীচি ইত্যাদি থেকে নানা ধরনের রঙ প্রস্তুত করা এবং তা দিয়ে সুতা বা বস্ত্র রঞ্জনের ধারা প্রচলিত ছিল। কিন্তু এতসব উদ্ভিদের নাম এবং তার করণকৌশল সংক্রান্ত বিবরণ কালাতিক্রম করে আমাদের হাতে এসে পৌঁছায়নি।

তারপরও এ কথা বলার যথেষ্ট কারণ আছে যে বাংলাদেশের তাঁতশিল্পের সোনালি যুগে অর্থাৎ খ্রিস্টপূর্ব চতুর্থ শতক থেকে খ্রিস্টীয় উনিশ শতক পর্যন্ত বাংলাদেশের প্রাকৃতিক রঞ্জন-প্রণালী ব্যাপকভাবে চর্চিত হতো এবং তা বিশেষ উৎকর্ষতাও লাভ করেছিল।

বাংলাদেশে যারা রঙের কাজ করত, তারা রংরেজ, নীলগর, নীলকসানে ইত্যাদি নামে পরিচিত ছিল। তারা সাধারণত তাঁতিপল্লির আশেপাশেই বসবাস করত। এই সম্প্রদায় বংশপরম্পরায় পূর্বপুরুষ থেকে লব্ধ জ্ঞান ও কৌশলকে কাজে লাগিয়ে প্রাকৃতিক পদ্ধতিতে সুতা ও কাপড় রঞ্জন করত। জেমস টেলরের লেখায় (১৮৪০) ঢাকার দুই পেশাজীবী সম্প্রদায় রংরেজ ও নীলগরের নাম উল্লেখিত হয়েছে। তবে উনিশ শতকের শেষার্ধে জেমস ওয়াইজের লেখা (১৮৮৩) থেকে এই দুই সম্প্রদায় সম্পর্কে চমৎকার বিবরণ পাওয়া যায়। রংরেজদের সম্পর্কে তিনি লিখেছেন, 'ঢাকায় রং-এর কাজ একটি মর্যাদাকর পেশা। রংরেজকে ঢাকায় সাফি অর্থাৎ পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার প্রতীক বলে গণ্য করা হয়। অনেকে তাদের ওস্তাদ বা খলিফা বলেও ডাকে। নিজেদের শ্রেণির বাইরে সাধারণত রংরেজরা বিয়েশাদি করে না। কুট্টি চামড়া-ফরোশ অথবা অন্য নিম্ন শ্রেণির লোকদের সঙ্গে সম্পর্কও রাখে না' (ওয়াইজ, ১৮৮৩, পৃ. ১২১)। রঞ্জন প্রক্রিয়ার কলা-কৌশল সংরক্ষণে রংরেজদের মধ্যে ছিল গভীর গোপনীয়তার ঐতিহ্য। তারা বিশ্বাস করত, এই বিদ্যা কেবল পরিবারের উত্তরাধিকারসূত্রে চলতে থাকবে-বহিরাগত কেউ যেন এর অংশীদার না হয়। তাই রংরেজ পরিবারে এই রঞ্জনবিদ্যা শুধুমাত্র পুরুষ উত্তরাধিকারীরাই শিখতে পারত। পরিবারের অবিবাহিত মেয়েদেরও এই বিদ্যা শেখানোর

অনুমতি ছিল না। এর পেছনে ছিল সামাজিক ও সাংস্কৃতিক যুক্তি-বিয়ের পর মেয়েরা অন্য পরিবারে চলে যায়, ফলে আশঙ্কা ছিল, তারা হয়তো এই বিশেষ রঙ প্রস্তুত ও প্রয়োগের গোপন কৌশল অন্য পরিবারে প্রচার করে দেবে। এইভাবে, রংরেজরা তাদের পূর্বপুরুষদের সঞ্চিত রঞ্জনবিদ্যার কলা-কৌশল প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে সংরক্ষণ করে নিজেদের পেশাগত ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য অক্ষুণ্ন রাখার চেষ্টা করেছে।

উনিশ শতকের শেষার্ধে জেমস ওয়াইজ রংরেজদের কাজের কিছু বিবরণ দিয়েছেন, সেটা উদ্ধৃত করা যাক : 'রং-এর প্রধান উপকরণ হলো কুমকুম। এর থেকে দু'টো রং হয়– গোলাপি আর উজ্জ্বল লাল। বিয়ের পোশাক আর পাগড়িতে হালকা রং ব্যবহার করা হয়। কুমকুম আর হলুদ মিশিয়ে হয় বাসন্তি রং। ...নীল ও বাসন্তি রং মিশিয়ে একটি রং বানানো হয় তাকে বলে "কাসনি"। আর নীল ও হলুদ মিলিয়ে আরেকটি রং হয় তাকে বলে "সবজি"। সাপ্পন কাঠের ছাল আর লাল মিশিয়ে হয় বেগুনি। সিল্কের কাপড়ে এই রং বহুল ব্যবহৃত। এটি তরুণ ব্রাহ্মণ ও অন্যদের খুবই পছন্দের রং। বৃষ্টির পানিতে এই রং উঠে যায় বলে প্রায়ই নতুন করে রাঙাতে যেতে হয় রংরেজ-এর কাছে। তাই রংরেজকে থাকতে হয় কর্মব্যস্ত' (ওয়াইজ, ১৮৮৩, পৃ. ১২২)। শুধু তাই নয়, 'পোশাকে একটি নকশার বিশেষ একটি রং করতে হলে অথবা পোশাকে ফুল বা জীবজন্তুর নকশায় সেই ফুল বা জীবজন্তুর রং-এর অবিকল নকল করতে হলে রংরেজরা আগে টুকরো কাপড় রং করে নিয়ে সেই অংশগুলো সেলাই করে জুড়ে দিতেন। কিন্তু যখন একটি রঙিন জমিনে ঢেউ খেলানো ডোরার প্রয়োজন হত, তখন রংরেজ কাপড়টিকে অনেক ভাঁজ দিয়ে নিতেন। তারপর এমনভাবে রং করা হত যাতে ভাঁজে রং না লাগে। এই ধরনের কাজকে বলা হত "চুনরি"(ওয়াইজ, ১৮৮৩, পৃ. ১২২)।

রংরেজ ছাড়াও নীলগর সম্প্রদায়ও বস্ত্র রঞ্জনের কাজ করত। জেমস ওয়াইজের ভাষ্যমতে, নিচু শ্রেণীর মুসলমানরা এই পেশায় নিযুক্ত ছিল। উনিশ শতকের শেষার্ধে ঢাকায় ছিল মাত্র তিন-চারটি পরিবার (ওয়াইজ, ১৮৮৩, পৃ. ১১৬)। নীলগরদের কাজ সম্পর্কে তিনি লিখেছেন, 'শুধুমাত্র নীল রং-এর কাজ করে এরা। খুব মিহি করে গুঁড়া করা নীল একটি মটকায় রাখা পানিতে মেশায়। মটকার অর্ধেক থাকে মাটিতে প্রোথিত। তাতে মেশায় সাজিমাটি আর "চোকার" গাছের গুটি। কয়েক দিন এভাবে ফেলে রাখলে পানিটা গেঁজিয়ে রং প্রস্তুত হয়। সূতা ও কাপড় রং করে নীলগর। মটকায় যতক্ষণ রং থাকবে, ওই রং-ই ব্যবহার করবে নীলগর, তা ফিকে অথবা গাঢ় যেভাবেই থাকনা কেনো' (ওয়াইজ, ১৮৮৩, পৃ. ১১৬)।

নীলগরদের অর্থনৈতিক ও সামাজিক অবস্থা মোটেই ভালো ছিল না। জেমস ওয়াইজের ভাষ্য, 'ভাগ্যাহত নীলগরদের অপরিবর্তনীয় দুর্দশার কথা প্রসঙ্গে ভারতে একটি প্রবাদ চালু আছে "নীলের মটকায় রং লেগেছে"। নীলগররা বিশ্বাস করে কোনো দৈবদুর্ঘটনায় মটকার নীল যদি খারাপ হয়ে যায়, তাহলে মানুষকে আজব কাহিনী শোনালে রং আবার ফিরে আসবে। কেউ গাঁজাখুরি গল্প বললে শ্রোতারা অতি বিনয়ের সঙ্গে নীলগরদের ওই বিশ্বাসের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। অর্থাৎ গল্পের সত্যতায় তার সন্দেহ আছে' (ওয়াইজ, ১৮৮৩, পৃ. ১১৬)।

কৃত্রিম বা রাসায়নিক রঙ পদ্ধতি অপেক্ষাকৃত অর্বাচীনকালের ঘটনা। উনিশ শতকের মাঝামাঝি ১৮৫৬ সাল নাগাদ পৃথিবীতে প্রথম কৃত্রিম রঙ আবিষ্কার হয় এবং পরবর্তী ৫০ বছরের মধ্যে রাসায়নিক কৃত্রিম রঙ বিষয়ে বিপুল অগ্রগতি ঘটে। কৃত্রিম রঙ বিষয়ে নানা রকম পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও আবিষ্কার এখনো একটি চলমান প্রক্রিয়া। কিন্তু বাংলাদেশে কৃত্রিম রঙের প্রচলন ঘটে ঠিক কবে এবং কীভাবে–তা দিন-তারিখ নির্দিষ্ট করে বলা সম্ভব নয়। তবে বিশিষ্ট গবেষক শাওন আকন্দ মনে করেন, ' ...বিভিন্ন সাক্ষ্য-প্রমাণ থেকে অনুমান করা যায়, সম্ভবত উনিশ শতকে কৃত্রিম রঙ বাংলাদেশে তেমন একটা প্রচলিত হয়ে ওঠেনি। বরং বিশ শতকের প্রথমার্ধ থেকে, আরো স্পষ্ট করে বললে ত্রিশের দশকে

(কিংবা তার আগেই), কৃত্রিম রঙ বাংলাদেশে প্রচলিত হয়েছিল এবং এ বিষয়ে সরকারের বিশেষ ভূমিকা ছিল (আকন্দ, ২০১৮, পৃ. ৯৯)। তিনি আরো লিখেছেন, ‘ ১৯০৭-০৮ সালের সরকারি প্রতিবেদনে কৃত্রিম রঞ্জনপ্রক্রিয়ার গুরুত্বের কথা উল্লেখ করা হয়েছে এবং বাংলাদেশে কৃত্রিম রঙের প্রসারের বিষয়ে বিবিধ পরামর্শ ও সুপারিশ করা হয়েছে। উদাহরণ হিসেবে দক্ষিণ ভারতের কথা বলা হয়েছে, যেখানে কৃত্রিম রঞ্জন পদ্ধতি ব্যবহার করে সেখানকার রঞ্জনশিল্পকে পুনরুজ্জীবিত করা হয়েছে। এই উদ্যোগের প্রধান পুরুষ প্রফেসর গজ্জারের (Professor Gajjar) বয়ান উদ্ধৃত করা হয়েছে ১৯০৭-০৮ সালের প্রতিবেদনে। শুধু তাই নয়, এই ১৯০৭-০৮ সালের সরকারি প্রতিবেদনে ঢাকায় একটি রঙঘর (ডাই হাউস) তৈরির সুপারিশ করা হয়েছে’ (আকন্দ, ২০১৮, পৃ. ৯৯)। কৃত্রিম রঞ্জনপ্রক্রিয়া সম্পর্কে এই প্রতিবেদনে প্রশংসা করা হয়েছে এবং প্রাকৃতিক রঙ থেকে তা যে কত উৎকৃষ্ট তা নানাভাবে বলা হচ্ছে, 'These chamichal dyes are much cheaper than vagitable dyes, are vivid and bright and suited to the popular taste, and it is a mistake to think that thay are all fugitive. Besides, every day the richness and fastness of their colouring matter is being steadily improved. On the other hand, as pointed out by Mr. Watson, it is a mistake to think that all indigenous vegetable dyes are fast, in fact most of them appear to be fugitive' (আকন্দ, ২০১৮, পৃ. ৯৯)।

ফলে দেখা যাচ্ছে, কৃত্রিম রঙ প্রচলনের সপক্ষে সরকারি মহলে প্রচারণা ও উদ্যোগ ছিল এবং বাংলাদেশের তাঁতশিল্পকে বাঁচানোর জন্য যে কৃত্রিম রঞ্জনপ্রক্রিয়া এখানে চালু করা অতীব জরুরি, তা নানাভাবে বলা হয়েছে। এই মনোভাবের বাস্তবায়ন হয়েছিল বিভিন্ন সরকারি বয়ন বিদ্যালয়গুলোর মাধ্যমে। বঙ্গীয় শিল্প বিভাগের ভ্রাম্যমাণ ও স্থায়ী বয়ন বিদ্যালয়গুলো এবং শ্রীরামপুরে সরকারের উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত বয়ন বিদ্যালয়টি (প্রতিষ্ঠা ১৯০৮) এ বিষয়ে বিশেষ ভূমিকা পালন করেছিল (আকন্দ, ২০১৮, পৃ. ৯৯)।

বর্তমানে তাঁতশিল্পে মূলত রাসায়নিক রঙ পদ্ধতি ব্যবহার করে সুতা রঙ করা হয়। বর্তমানে বাংলাদেশে বিভিন্ন পদ্ধতির কৃত্রিম রঙ প্রচলিত আছে। এর মধ্যে বহুল প্রচলিত ও জনপ্রিয় পদ্ধতি হলো ভ্যাট ও ন্যাপথল। এ ছাড়াও দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে যেসব পদ্ধতিতে রঙ করা হয়, সেগুলোর মধ্যে কয়েকটি হলো– ডাইরেক্ট, বেসিক বা ক্ষারজাতীয়, এসিড বা টকজাতীয়, সালফার বা গন্ধকজাতীয়, মরড্যান্ট বা আস্তরজাতীয়, অক্সিডেশন কালার, মিনারেল বা ধাতবজাতীয় ইত্যাদি। হস্তচালিত তাঁতশিল্পের জন্য তো বটেই, যন্ত্রচালিত তাঁতের জন্যও এই সব পদ্ধতি ব্যবহার করে সুতা বা কাপড় রঙ করা হয়। এসব পদ্ধতির মধ্যে নানা রকম ভিন্নতা আছে। আছে নানা রকম সুবিধা ও অসুবিধা। স্থানীয় রঞ্জনশিল্পীরা রাসায়নিক পদ্ধতি ব্যবহার করে সুতা রঙ করে থাকে। স্থানীয় সুতা ব্যবসায়ীরা সেসব সুতা নিজেদের দোকানে বিক্রয় করে। তবে কখনো কখনো তাঁতিরাও নিজেরা রঞ্জনশিল্পীদের দিয়ে সুতা রাঙানোর কাজটি করে থাকে। তবে কিছু কিছু প্রাকৃতিক রঙ ব্যবহারের সংবাদ জানা গেলেও তার পরিমাণ খুব কম।

বাংলাদেশের ফ্যাশনশিল্প : বিবর্তনের রূপরেখা

বাংলাদেশের ফ্যাশনশিল্পের বিবর্তন একদিকে যেমন সমাজ-সংস্কৃতির পরিবর্তনের একটি দৃশ্যমান রূপ, অন্যদিকে অর্থনীতি ও শিল্প-বিন্যাসেরও দীর্ঘ অভিযাত্রা। প্রাক্-ঔপনিবেশিক বাংলার পোশাক-সংস্কৃতি ছিল মূলত স্থানিক বৈশিষ্ট্য, আবহাওয়া, পেশা ও সামাজিক পরিচয়ের ওপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠা-গামছা, খদ্দর, নকশিকাঁথা, শাড়ি-পাঞ্জাবি বা লুঙ্গির মতো পোশাকে ছিল সহজতা ও ব্যবহারিকতা। উপনিবেশিক শাসনের সঙ্গে আসা ইউরোপীয় ফ্যাশন-রীতি প্রথমে ছিল এলিট-বৃত্তে সীমাবদ্ধ; কিন্তু সময়ের সঙ্গে সঙ্গে তা শহরকেন্দ্রিক মধ্যবিত্তের পোশাকেও ঢুকে পড়ে, ফলশ্রুতিতে পোশাক হয়ে ওঠে

আধুনিকতা ও পরিচয়ের দ্বৈত প্রতীক। স্বাধীনতা-পরবর্তী দশকে বাংলাদেশে ফ্যাশনশিল্প মূলত তাঁতভিত্তিক শাড়ি, কুটি-দর্জি নির্ভর সেলাই কিংবা টেইলারিঙের ওপর দাঁড়িয়ে থাকলেও আশির দশকের শেষে বুটিক সংস্কৃতি আবির্ভূত হয় একটি নতুন মোড় ঘুরিয়ে-দেশীয় বয়নকৌশল, স্থানীয় রং ও মোটিফকে আধুনিক নকশায় উপস্থাপনের মাধ্যমে 'লোকজ-আধুনিক' ফ্যাশনের ভিত্তি তৈরি হতে থাকে।

নব্বইয়ের দশক ছিল বাংলাদেশি ফ্যাশনের এক রূপান্তরমুখী সময়। বেসরকারি টেলিভিশন, ফ্যাশন শো, মডেলিং, ডিজাইনার পেশা-সব মিলিয়ে পোশাক কেবল ব্যবহারিক প্রয়োজন নয়, এক ধরনের স্টাইল-চেতনা ও সৃজনশীলতার প্রকাশ হয়ে দাঁড়ায়। এই সময়েই তৈরি হয় প্রথম প্রজন্মের ফ্যাশন ব্র্যান্ড, যেগুলো দেশীয় কাপড়কে শহুরে ভোক্তা-দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে মিলিয়ে দেয়। একই সঙ্গে তৈরি হয় নারীর পোশাক-স্বাতন্ত্র্যবোধের নতুন পরিসর-সালোয়ার-কামিজ, কুর্তা, ফিউশনওয়্যার ইত্যাদি ধীরে ধীরে শাড়িকে একচেটিয়া আধিপত্য থেকে সরিয়ে আনে। তবে এই পরিবর্তন কখনোই পুরোপুরি পশ্চিমায়ন ছিল না; বরং বলা যায়, এটা ছিল 'বাংলাদেশি ফ্যাশন আইডেন্টিটি' খুঁজে পাওয়ার এক দীর্ঘ সামাজিক পরীক্ষা, যেখানে জনপ্রিয়তা পেয়েছে ঐতিহ্য ও আধুনিকতার মিশ্র রূপ।

বিশ্বায়ন ও প্রযুক্তির উত্থান একবিংশ শতকে ফ্যাশনশিল্পকে ভিন্নমাত্রা দেয়। ফাস্ট ফ্যাশন, রেডিমেড গার্মেন্টস, ই-কমার্স-সব মিলিয়ে ফ্যাশন যেন হয়ে ওঠে গতিময়, প্রাপ্যতা-নির্ভর ও প্রবণতাকেন্দ্রিক। একদিকে বৃহৎ গার্মেন্টস শিল্প বিশ্ববাজারে বাংলাদেশের পরিচিতি তৈরি করে, অন্যদিকে সেই শিল্পের অর্থনৈতিক সুবিধা স্থানীয় ফ্যাশন ব্যবসায় পরোক্ষ প্রভাব ফেলে। ব্র্যান্ডেড পোশাক, সোশ্যাল মিডিয়াভিত্তিক ফ্যাশন কনটেন্ট, সিজনাল কালেকশন বা থিম-বেইসড ডিজাইন-এসব কিছুই একটি পেশাদার ফ্যাশন ইকোসিস্টেম গড়ে তোলে। এর পাশাপাশি তরুণ ডিজাইনাররা আবারও লোকজ বয়ন, জামদানি নকশা, রঙিন টাঙ্গাইল শাড়ি, মসলিন পুনরুজ্জীবন, বা গামছা-ভিত্তিক স্ট্রিট ফ্যাশনকে সামনে এনে দেখান যে 'দেশি' বলে কোনো কিছু পুরনো নয়-বরং নতুন চোখে দেখলে তা হয় আন্তর্জাতিক মানের নান্দনিক সম্পদ।

তবে এই বিবর্তনের মাঝেও কিছু অনিবার্য প্রশ্ন সামনে আসে-আমাদের ফ্যাশন কি কেবল বাজার-চালিত, নাকি সাংস্কৃতিক আত্মপরিচয়ের অংশ? বুটিক ও ব্র্যান্ড বড় হচ্ছে, কিন্তু কারিগর কি সামনে এগোচ্ছে? ফ্যাশনে যে গল্পটা আমরা দেখি, তা কি কেবল শহরের, না গ্রামও তার অংশ? বাংলাদেশি ফ্যাশনশিল্পের ভবিষ্যৎ সম্ভবত এই প্রশ্নগুলোর উত্তরের মধ্যেই লুকিয়ে আছে। আমার পর্যবেক্ষণে, বাংলাদেশের ফ্যাশনশিল্পের শক্তি হলো তার 'মূলের দিকে ফিরে যাওয়ার ক্ষমতা'-নতুনত্ব যতই আসুক, আমাদের পোশাক-চেতনার কেন্দ্রে থাকে রঙ, হাতে বোনা কাপড়, কারিগরির মর্যাদা, আর আবহমান বাংলার সৌন্দর্যবোধ। প্রযুক্তি, নকশা-চিন্তা, গ্লোবাল বাজার-সবকিছুর সঙ্গে তাল মিলিয়েও যদি এই ভিত্তি টিকে থাকে, তবে বাংলাদেশের ফ্যাশনশিল্প শুধু অর্থনীতির চাকা ঘুরাবে না, বরং দেশের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকেও বিশ্বমঞ্চে দৃশ্যমান করে তুলবে-সেটাই, সম্ভবত, এই দীর্ঘ বিবর্তনের প্রকৃত সার্থকতা।

বাংলাদেশের তাঁতশিল্প ও ফ্যাশন

ক. কৃৎকৌশলগত পরিবর্তন : উপনিবেশিক সরকারের ভূমিকা ও উদ্যোগ

আমরা যদি গভীরভাবে বাংলাদেশের তাঁতশিল্পের ইতিহাস পর্যবেক্ষণ করি তাহলে দেখতে পাবো– বিশ শতকের শুরুতে, প্রথম ত্রিশ বছরের মধ্যেই, বাংলাদেশের ঐতিহ্যবাহী তাঁতশিল্পের সনাতনী পদ্ধতিগুলোর বদলে নতুন নতুন করণ কৌশলের সূত্রপাত ঘটেছে। এর ফলে শতশত বছর ধরে বাংলাদেশের তাঁতিরা যে পদ্ধতি ও কৌশল অবলম্বণ করে বস্ত্রবয়ন করতো তার পরিবর্তন ঘটে গেছে। এটা একটা অভূতপূর্ব ঘটনা এবং এই ঘটনার প্রভাব পড়েছে বাংলাদেশের তাঁতশিল্পে উল্লেখযোগ্য

মাত্রায়। তৎকালীণ বঙ্গীয় কৃষি ও শিল্প বিভাগ (Agriculture and Industries Department, Government of Bengal) এবং কারিগরী শিক্ষা সংক্রান্ত সরকারী নথিপত্র দেখলে এই পরিবর্তনের কারণ ও উপলক্ষ সম্পর্কে জানা যায় (আকন্দ, ২০১৮, পৃ. ৩১৩)। সেখানে দেখা যাচ্ছে, বিশ শতকের প্রথম দশকেই এবিষয়ে উদ্যোগ নেয়া হয়েছিল এবং ১৯০৮ সালে সেই উদ্যোগের ফল স্বরূপ শ্রীরামপুরে একটি বয়ন বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। পরবর্তীকালে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে আরো অনেকগুলো স্থায়ী ও ভ্রাম্যমান বয়ন বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এবং এই স্থায়ী ও ভ্রাম্যমান বয়ন বিদ্যালয়গুলোর মাধ্যমে এদেশের তাঁতশিল্পের বেশ কিছু গুরুতর পরিবর্তন ঘটে। এই পরিবর্তন ঘটেছিল ১৯২০ থেকে ১৯৩০ সালের মধ্যেই। প্রথমত সনাতন গর্ত তাঁতে হাতে ছোড়া মাকুর বিকল্প হিসেবে ফ্লাই সাটল লুম বা ঠকঠকি তাঁতের প্রচলন ঘটে। এর ফলে বস্ত্র উৎপাদনের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। দ্বিতীয়ত ডবি ও জ্যাকার্ড মেশিনেরও অল্পবিস্তর প্রচলন ঘটে। এর ফলে তাঁতের কাপড়ে বিভিন্ন ধরনের নকশা করা সহজ হয়ে যায়। তৃতীয়ত কৃত্রিম রঞ্জন পদ্ধতির সূচনা ঘটে। এর ফলে সুতা ও কাপড়ে নানা ধরণের রঙ করা সহজ হয়ে যায়। রঙে নানারকম বৈচিত্র আসে। কিন্তু একারণে পাশাপাশি সনাতনী প্রাকৃতিক রঞ্জনশিল্প ক্রমশ বিলুপ্ত হয়ে যেতে থাকে।

তাহলে বিশ শতকের প্রথমার্ধে বয়ন বিদ্যালয়গুলোর মাধ্যমে সরকারী উদ্যোগে যেসব পরিবর্তন ঘটে বাংলাদেশের তাঁতশিল্পের নানাক্ষেত্রে তার ফলাফল কি দাড়ালো? উন্নত শ্রেণির তাঁতযন্ত্র ব্যবহার করার কারণে বস্ত্র উৎপাদনের পরিমাণ বাড়লো। বলাই বাহুল্য এর অধিকাংশই ছিল মোটা কাপড়। পাশাপাশি সূক্ষ্ম বা মিহি কাপড়ও অবশ্য কিছু হতো। কিন্তু তার পরিমাণ উল্লেখযোগ্য ছিলনা। সূক্ষ্ম ও মিহি মসলিন তখন আর বয়ন হতো না। তাঁতির অভাবে নয়, তখনও কিছু তাঁতি ছিল যারা মিহি মসলিন বয়নের ক্ষমতা রাখতো কিন্তু বিশ শতকের শুরুতে এর সবচেয়ে বড় বাঁধা ছিল মসলিনের উপযোগী হাতে কাটা সুতার অভাব। কলের সুতা দিয়ে তখনও কিছু মসলিন হতো বটে কিন্তু তা তো আসল মসলিন নয়।

ফ্লাই সাটল লুম বা ঠকঠকি তাঁতের পাশাপাশি ডবি ও জ্যাকার্ড মেশিন ব্যবহার শুরু হয় এই সময়। এর ফলে নকশায় নানারকম বৈচিত্র আনা সহজ হয়ে যায়। নতুন এই প্রযুক্তির কারণে ডোরা কাটা, স্ট্রাইপ, চৌকো কিংবা একরঙা কাপড়ের বদলে বিভিন্ন ধরনের নকশাসমৃদ্ধ বস্ত্র বয়ন শুরু হয়। একমাত্র জামদানি ও বালুচরী ছাড়া আর কোন তাঁতের কাপড়ে এর আগে এতো পরিমাণ নকশা দেখা যায়নি–সেই সুযোগও ছিলনা। ফলে বাংলাদেশের তাঁতের কাপড়ের নকশায় পরিবর্তন আনে নতুন প্রযুক্তি– ডবি ও জ্যাকার্ড।

আরেকটি ব্যাপক পরিবর্তন ঘটে রঙের ক্ষেত্রে। দীর্ঘদিন ধরে বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে প্রাকৃতিক উপাদান দিয়ে সুতা ও কাপড় রঙ করার পদ্ধতি প্রচলিত ছিল। কিন্তু বয়ন বিদ্যালয়গুলোর কর্মতৎপরতায় কৃত্রিম রঙ করার কলাকৌশল বিভিন্ন অঞ্চলের মানুষদের শিখিয়ে দেয়া হয় এবং এই পদ্ধতিতে রঙ করতে উৎসাহিত করা হয়। উজ্জ্বল ও আকর্ষণীয় রঙের কারণে এটা দারুণ জনপ্রিয় হয়ে ওঠে অতি দ্রুত। যেসব পেশাজীবী সম্প্রদায় প্রাকৃতিক পদ্ধতিতে রঙ করতো (যেমন রংরেজ, নীলগর) তাদের বিলুপ্তি ঘটে এবং নতুন এক পেশাজীবী শ্রেণি তৈরি হয় যারা কৃত্রিম পদ্ধতিতে রঙ করা শুরু করে। নতুন এই পেশাজীবীদের নাম হয় 'রঙ মাস্টার'। কৃত্রিম পদ্ধতিতে রঞ্জনপ্রক্রিয়া চালু হলে বাংলাদেশের তাঁতশিল্প রঙের জন্য পরনির্ভরশীল হয়ে উঠে। কেননা যেসব কৃত্রিম রঙ এই প্রক্রিয়ায় ব্যবহার শুরু হয় তা সবই বিদেশ থেকে আমদানি করতে হতো।

তাহলে দেখা যাচ্ছে, বিশ শতকের প্রথমার্ধে সরকারী উদ্যোগে যে পরিবর্তনগুলো ঘটে এর ফলে তাঁতবস্ত্রের উৎপাদন খানিকটা বৃদ্ধি পায়–একথা অনস্বীকার্য। কিন্তু তখন সুতা তৈরিতে যে তুলা ব্যবহার করা হতো তা মূলত বিদেশ থেকে আনতে হতো। তাঁতশিল্পে যে সুতা ব্যবহার করা হতো তা বিদেশে তৈরি কিংবা বিদেশী প্রযুক্তিতে ভারতে বা বাংলাদেশে তৈরি করা হতো। যে তাঁতযন্ত্র ব্যবহার

করে এবং যে নতুন প্রযুক্তি ব্যবহার করে বস্ত্র বয়ন শুরু হয় তাতে কাপড়ের নকশার বৈচিত্র্য বাড়ে বটে কিন্তু সেই তাঁতযন্ত্র বা ডবি বা জ্যাকার্ড মেশিন এদেশের মানুষের আবিষ্কার নয়। এগুলো বিদেশ থেকে আনা হয়েছে এবং এখানে, এই দেশে সরকারী উদ্যোগে তা প্রচলন করা হয়েছে। এমনকি কৃত্রিম রঙ ব্যবহার করে যে রঙ করার প্রক্রিয়া চালু হলো–সেটাও ধার করা। কৃত্রিম রঙ বিদেশ থেকে আমদানি করা হতো এবং এখনো হয়। নিজেদের বা এদেশের বলতে থাকলো শুধু বিভিন্ন তাঁতি সম্প্রদায়। তারা নিতান্তই টিকে থাকার তাগিদে নতুন এই পদ্ধতি শিখে ও আত্তীকরণ করে কাজ চালিয়ে যেতে থাকে।

নিঃসন্দেহে ব্রিটিশ আমলে সরকারী উদ্যোগে ও সহায়তায় বাংলাদেশের হস্তচালিত তাঁতশিল্পের জন্য যে সব পরিকল্পনা ও উদ্যোগ হাতে নেয়া হয়েছিল তার ফলে এদেশের তাঁতশিল্পের গতি ও প্রকৃতি ব্যাপকমাত্রায় পরিবর্তিত হয়ে গিয়েছিল। গবেষক শাওন আকন্দ যথার্থই মন্তব্য করেছেন, 'কিন্তু প্রশ্ন হলো, এই পরিবর্তনের ফলে যে নতুন ধারার তাঁতশিল্প বাংলাদেশে বিকাশ লাভ করলো তাকে কি বাংলাদেশের ঐতিহ্যবাহী তাঁতশিল্প বলা যায়? তুলা, সুতা, তাঁতযন্ত্র ও আনুষঙ্গিক যন্ত্রপাতি, কৃত্রিম রঙ ও রঞ্জনপ্রক্রিয়া–সবই যখন বিদেশ থেকে আমদানি করা কিংবা ধার করা– তাহলে সেটা কি করে আমাদের দেশের ঐতিহ্য হয়? শুধু বাংলাদেশের তাঁতিরা বয়ন করলেই কি তা এদেশের ঐতিহ্যের অংশ হয়ে যায়' (আকন্দ, ২০১৮, পৃ. ৩১৪)? নিশ্চিতভাবেই এই প্রশ্নের উত্তর খুব সহজ নয় এবং তা নিয়ে ব্যাপক ভাবনা-চিন্তার অবকাশ রয়েছে।

খুব সম্ভবত এদেশের সনাতনী তাঁতশিল্পের ঐতিহ্যবাহী ধারাটি উনিশ শতকের মধ্যেই অনেকাংশে ক্ষীণ হয়ে এসেছিল। বিশিষ্ট গবেষক শাওন আকন্দ আরো বলেছেন, ' বিশশতকের প্রথমার্ধে সরকারি উদ্যোগে যেসব পরিবর্তন ঘটে তার ফলে সনাতনী ধারার যেটুকু অবশিষ্ট ছিল তা গুরুতর বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয় এবং সনাতনী ধারার তাঁতশিল্প অনেকাংশে বিলুপ্ত হয়ে যায়। এর বিপরীতে গড়ে ওঠে বিদেশের তুলা, সুতা, তাঁত, রঙ ও কৃৎকৌশল নিয়ে এদেশের তাঁতিদের বোনা নতুন ধারার তাঁতশিল্প। এই ধারাই ক্রমশ বিকশিত হয়েছে এবং তা এখনো বিদ্যমান। এটাই বর্তমানে বাংলাদেশের 'ঐতিহ্যবাহী'(!) তাঁতশিল্পের মূলধারা। ফলে তৎকালীন সরকার বা ব্রিটিশ শাসক শ্রেণির উদ্যোগ ও কর্মতৎপরতার ফলাফল বা প্রভাব বাংলাদেশের তাঁতশিল্পে এখনো বিদ্যমান–এটা বলা যায় (আকন্দ, ২০১৮, পৃ. ৩১৪)।

খ. দেশভাগের প্রভাব ও পাকিস্তানপর্ব

১৯৪৭ সালে ব্রিটিশ উপনিবেশিক শাসনের অবসান ঘটে এবং ধর্মীয় ভিত্তিতে ভারত উপমহাদেশ বিভক্ত হয়ে ভারত ও পাকিস্তান নামে দুটি রাষ্ট্রের সৃষ্টি হয়। পাকিস্তানের ছিল আবার দুটি অংশ–পূর্ব পাকিস্তান ও পশ্চিম পাকিস্তান। বর্তমান বাংলাদেশ ভূখন্ড তখন পূর্ব বাংলা বা পূর্ব পাকিস্তান নামে পাকিস্তানের অন্তর্গত ছিল। এই ভূখন্ডের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাসে এই দেশভাগের প্রভাব পড়েছে উল্লেখযোগ্য মাত্রায়। বাংলাদেশের তাঁতশিল্পও এর ব্যতিক্রম নয়।

দেশভাগের ফলে বাংলাদেশের তাঁতশিল্পে প্রাথমিক যে প্রতিক্রিয়া দেখা যায় তা হলো তাঁতিদের দেশান্তরের গল্প। এদেশের তাঁতিদের একটা বড় অংশ ছিল হিন্দু ধর্মাবলম্বী–যেমন–বসাক তাঁতি, বঙ্গ তাঁতি, যোগী, কাপালী ইত্যাদি। তাছাড়া আর্থিক লাভজনক এই বিবেচনায় কিংবা স্বদেশী আন্দোলনের কালে অনেক নমশুদ্র ও অন্যান্য জাতের লোক তাঁতের কাজ বেছে নিয়েছিল পেশা হিসেবে। তাছাড়া তাঁতবস্ত্রের ব্যবসার সাথেও যুক্ত ছিল অনেক হিন্দু ব্যবসায়ী। তাঁতের সাথে যুক্ত এই হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের একটা বড় অংশ নিজেদের বসতবাড়ি ও মাতৃভূমি ত্যাগ করে ভারতের পশ্চিমবাংলাসহ অন্যান্য প্রদেশে চলে যায়। স্বাভাবিক কারণেই, এদেশের তাঁতশিল্পের উপর এর নেতিবাচক প্রভাব পড়ে ।

পক্ষান্তরে, দেশভাগের কারণে, ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ থেকে অনেক মুসলমান ধর্মাবলম্বী বাংলাদেশে (তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান) চলে আসেন নতুন জীবনের খোঁজে। এদের মধ্যে তাঁতের কাজের সাথে যুক্ত ছিলেন অনেকেই। অবাঙ্গালী মুসলমান তাঁতিদের মধ্যে বেনারস থেকে আসা বেনারসী তাঁতিরা–বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। কেননা, এদের মাধ্যমে বাংলাদেশে বেনারসী শাড়ির একটা নতুন ঘরানা চালু হয়। অবশ্য এছাড়াও পশ্চিমবাংলা বা বাংলাদেশের সীমান্তবর্তী ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে বাঙালী মুসলমান তাঁতিদের অনেকে বাংলাদেশে এসেছিলেন। তবে তারা ক্রমে এদেশের মূল তাঁতশিল্পের ধারার সঙ্গে মিশে গেছে। বেনারসী তাঁতিদের মতো তাদের এখন আলাদা করে চিহ্নিত করা মুশকিল। আর তাছাড়া বিশেষ কোন ঘরানাও তারা তৈরি করতে পারেনি।

পাকিস্তানপর্বে (১৯৪৭-১৯৭১) বাংলাদেশের তাঁতশিল্পের ইতিহাসে আরো যে পরিবর্তনগুলো ঘটে তা হলো এই কালপর্বে বাংলাদেশে অনেকগুলো তাঁতকল বা কটন মিল তৈরি হয়। কেননা দেশভাগের পর এদেশের তাঁতশিল্পের চাহিদা মেটানোর মতো সুতার কারখানা বা কটন মিল ছিল না। সুতার অভাব দুর করার জন্য মূলত এই উদ্যোগ নেয়া হয়েছিল। তারপরও সুতার চাহিদা সেসময় পুরোপুরি মিটেছিল বলে মনে হয় না। অন্তত তৎকালীন পত্রিকায় প্রকাশিত সংবাদ পড়ে এরকমই মনে হয়। আর পাকিস্তানপর্বে বাংলাদেশে তুলা চাষের তেমন কোন উদ্যোগ নেয়া হয়নি। পাকিস্তানের দুই অংশের তুলার মূল উৎপাদন কেন্দ্র ছিল পশ্চিম পাকিস্তান। বাংলাদেশে তুলার উৎপাদন তেমন একটা না থাকার প্রতিক্রিয়া দেখা গিয়েছিল দেশ স্বাধীন হবার পর, সত্তরের দশকের প্রথমার্ধে। আসলে পাকিস্তান সরকারের অনাগ্রহ ও বিরুদ্ধ-নীতির কারণে এদেশের তাঁতশিল্প সেভাবে বিকশিত হয়নি। তবে পাকিস্তান আমলেই, ষাটের দশকে, বিভিন্ন ঘটনার সূত্র ধরে বাংলাদেশে বাংলা ভাষা ও বাঙালি সংস্কৃতির উপর ভিত্তি করে বাঙালি জাতীয়তাবাদী চেতনার বিকাশ ঘটে এবং ক্রমে স্বাধীকার ও স্বাধীনতা আন্দোলন দানা বেধে উঠে। অবশেষে নয়মাস মুক্তিযুদ্ধের পর বাংলাদেশ স্বাধীনতা লাভ করে এবং স্বাধীন, সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে পৃথিবীর বুকে মাথা তুলে দাড়ায়। পরবর্তীকালের বাংলাদেশের তাঁতশিল্পে উল্লেখযোগ্য মাত্রায় এই ঘটনার প্রভাব পড়েছে ।

গ. বাংলাদেশপর্ব

বাংলাদেশ স্বাধীনতা লাভ করলে আরো অনেক ক্ষেত্রের মতো তাঁতশিল্পেরও নানা সম্ভাবনা দেখা যায়। তবে প্রাথমিকভাবে সবচেয়ে বড় যে সংকটের সম্মুখিন হতে হয় তা হলো তুলার অভাব। পাকিস্তান আমলে বাংলাদেশের তাঁতশিল্প তুলার জন্য পাকিস্তানের উপর নির্ভরশীল ছিল। কিন্তু স্বাধীনতা লাভ করে আলাদা হয়ে যাওয়ার কারণে সেখান থেকে তুলা আসার পথ বন্ধ হয়ে যায়। প্রাথমিক ভাবে এই সংকট মোকাবেলার জন্য সত্তরের দশকে ব্যাপক সরকারী উদ্যোগ নেয়া হয় । কিন্তু তা নানা কারণে অচিরেই ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। এর পর থেকে বাংলাদেশে তুলা চাষের ব্যাপক পরিকল্পনা করা হয়নি। যদিও স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশে তুলার মিল বা কটন মিলের সংখ্যা আরো বেড়েছে। তবে তুলার জন্য বাংলাদেশ আশির দশক থেকে এখনো পর্যন্ত প্রায় পুরোপুরি আমদানির উপর নির্ভরশীল।

আশির দশক থেকে বাংলাদেশের প্রাকৃতিক রঞ্জন পদ্ধতি বিষয়ে গবেষণা শুরু হয়েছে। খুব সীমিত পরিসরে হলেও নাগরিক মহলে এ বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি পেয়েছে। তবে এখনো তা একটি গন্ডির ভেতর আবদ্ধ হয়ে আছে।

স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশে পাওয়ার লুমের সংখ্যা আরো বৃদ্ধি পেয়েছে। এর প্রভাব পড়েছে হস্তচালিত তাঁতশিল্পের উপর। সত্তর ও আশির দশকেও মিলের কাপড় ও হস্তচালিত তাঁতের কাপড় –উভয়েরই বাজার ছিল। কিন্তু নব্বইয়ের দশক থেকে পাওয়ার লুমের প্রভাবে এবং পাওয়ার লুমে উৎপাদিত তাঁত-পণ্যের সাথে টিকতে না পেরে হস্তচালিত তাঁতশিল্প ক্রমশ ক্ষয়িষ্ণু। এই সময় থেকেই

ব্যাপক পরিমান হস্তচালিত তাঁতে কাপড় উৎপাদন বন্ধ হয়ে যায় এবং ব্যাপক সংখ্যক তাঁতি কাজ ছেড়ে অন্য পেশায় যুক্ত হয়।

তবে বাংলাদেশপর্বে সবচেয়ে বড় যে পরিবর্তনটি ঘটেছে সেটা হলো বাঙালি-সংস্কৃতি ও চেতনার উপর ভিত্তি করে হস্তচালিত তাঁতশিল্পের নতুন বাজার তৈরি হয়েছে শহরে। প্রধানত মধ্যবিত্ত ও দেশি এলিট শ্রেণী এবং কিছু বিদেশি এই বাজারের মূল ক্রেতা। সত্তরের দশকে এই বাজার তৈরি শুরু হলেও আশি ও নব্বইয়ের দশকে তা বিকশিত হয় এবং বর্তমানে নগরের এই নতুন বাজার এদেশের হস্তচালিত তাঁতশিল্পের জন্য অনেকাংশে সহায়ক হয়েছে। অনেক তাঁত কারখানায় আবার কাজ শুরু হয়েছে শহরের নতুন বাজারকে কেন্দ্র করে। নগরের এই বাজার তৈরিতে শহরের বিভিন্ন ফ্যাশন হাউসগুলো গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। বিষয়টি খানিকটা ব্যাখ্যা করা প্রয়োজন।

১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন থেকে '৭১এর স্বাধীনতা সংগ্রাম–এই পর্বে পূর্ব বাংলা বা পূর্ব পাকিস্তানে নতুন চেতনার উন্মেষ ঘটে, যেটাকে বাঙালি জাতীয়তাবাদ বলা হয়। এর মূল ভিত্তি হলো বাঙালি সংস্কৃতি। মূলত বাঙালি জাতীয়তাবাদের উপর ভিত্তি করে দীর্ঘ আন্দোলন ও শেষ পর্যন্ত সশস্ত্র সংগ্রামের মাধ্যমে যে দেশের জন্ম হয় তার ক্ষমতাকাঠামোর কেন্দ্রে যায় বাঙালি মধ্যবিত্ত ও বাঙালি এলিট গোষ্ঠী। স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশে এই দুই গোষ্ঠীর ভেতর বাঙালি সংস্কৃতির বিভিন্ন অনুষঙ্গ নতুন করে চর্চা ও অনুশীলন করার প্রবণতা দেখা যায়। জাতীয়তাবাদী চেতনার সঙ্গে এটা খুব সামঞ্জস্যপূর্ণও বটে। এর ফলে, আমরা দেখি লোকশিল্পের বিভিন্ন উপাদানের প্রতি শহরের মানুষের বিশেষ মনোযোগ বৃদ্ধি পেয়েছে। যদিও পঞ্চাশের দশক থেকে শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন, কামরুল হাসান প্রমুখ শিল্পী চারুকলা ইনস্টিটিউট, বিসিক ইত্যাদি প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে লোকশিল্পের প্রচার ও প্রসারে কিছু কিছু কাজ করেছিলেন। তবু বাংলাদেশ স্বাধীন হবার পর বাঙালি সংস্কৃতি ও বাঙালি চেতনার যে বাতাস দেশজুড়ে প্রবাহিত হয়েছিল, তার ফলস্বরূপ বাংলাদেশের তাঁতশিল্পের বাজার ও বিপননের উপরেও বিশেষ প্রভাব পড়েছিল। এবং এই প্রভাব সুদুরপ্রসারী হয়েছিল। শহরে এই প্রভাব বিশেষভাবে দেখা যায় বিভিন্ন বুটিক হাউস বা ফ্যাশন হাউসগুলোর উত্থানের ভেতরে।

স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশে মোটামুটি সত্তরের দশক থেকে বিভিন্ন কারুশিল্প প্রতিষ্ঠান লোকশিল্পের বিভিন্ন উপাদানের পাশাপাশি তাঁতপণ্যকে বিশেষ গুরুত্ব দিতে শুরু করেছিল। এর কারণ দেশে একটি নতুন শ্রেণি তৈরি হয়েছিল যারা দেশীয় সংস্কৃতিকে পৃষ্টপোষকতা করতে আগ্রহী ছিল। এবং তাদের বিশেষ আগ্রহ ছিল তাঁতবস্ত্রের প্রতি। কিন্তু সনাতনী প্রথায় যেসব তাঁতবস্ত্র তৈরি হচ্ছিল তা শহরের মানুষের রুচি ও নান্দনিকতাবোধের সঙ্গে ঠিক যুতসই ছিল না। কিন্তু গ্রামের নিরক্ষর তাঁতির পক্ষে শহরের মানুষের রুচি সম্পর্কে জানাও সহজ ছিলনা। শ্রেণিগত ব্যবধান একটা বড় অন্তরায় ছিল। এই ব্যবধান ঘোচাতে শহরের বিভিন্ন বুটিক হাউস বা ফ্যাশন হাউসগুলো গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। সত্তরের দশকে শুরু হলেও আশি ও নব্বইয়ের দশকে ফ্যাশন হাউসগুলো বিকশিত হয়ে উঠে। আর গত বিশ বছরেরও অধিক সময় ধরে (২০০১-২০২৫) এই ফ্যাশন হাউসগুলোর সংখ্যা ও পরিমাণ যে শুধু বৃদ্ধি পেয়েছে তাই নয়, বাংলাদেশের তাঁতশিল্পের বাজারে এগুলোর ভূমিকাও বিশেষ উল্লেখযোগ্য হয়ে উঠেছে।

এখানে কয়েকটি বিষয় লক্ষনীয়। প্রথমত- বাংলাদেশে ফ্যাশন হাউসগুলোর উত্থান ও বিকাশের পেছনে পরোক্ষভাবে হলেও রাজনৈতিক উত্থান-পতনের ভূমিকা আছে। বাঙালি সংস্কৃতি ও বাঙালি জাতীয়তাবাদী চেতনার উপর ভিত্তি করে রাজনৈতিক আন্দোলনের ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশ যদি স্বাধীনতা লাভ না করতো তাহলে এইসব বুটিক বা ফ্যাশন হাউসগুলোর উন্মেষ ঘটতো কি না–তা নিয়ে যথেষ্ট সন্দেহের অবকাশ রয়েছে।

দ্বিতীয়ত- সচরাচর যে বাঙালি সংস্কৃতির কথা বলা হয় সেখানে বাংলার তাঁতশিল্পের একটা বড় ভূমিকা ছিল এবং আছে। কিংবদন্তির মসলিন কিংবা জামদানির কথা মনে করে বাঙালি মাত্রই গৌরব

বোধ করে। বাঙালি সাংস্কৃতিক চেতনার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়ায় তাঁতশিল্প বাংলাদেশের মধ্যবিত্ত ও এলিট শ্রেণির দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। তারা এটাকে অনেকটা প্রতীক হিসেবে গ্রহণ করেছে। এখানে লক্ষণীয়, বাংলা বর্ষবরণ উপলক্ষে মেয়েদের লাল পাড় সাদা শাড়ি এবং ছেলেদের সাদা বা রঙিন পাঞ্জাবী পড়ার রেওয়াজ মোটেই শতাব্দী প্রাচীন নয়। মূলত ষাটের দশক থেকে ছায়ানটের অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে এর সূত্রপাত। আর পরবর্তীকালে চারুকলার মঙ্গল শোভাযাত্রা (আশির দশক) এটাকে আরো বেগবান করেছে। খুব একটা প্রাচীন না হলেও বর্তমানে জাতীয় পর্যায়ে বাংলা বর্ষবরণের কেন্দ্রিয় ঘটনায় পরিণত হয়েছে ঢাকার এই দুটি অনুষ্ঠান। এর অনুকরণে এখন দেশের বিভিন্ন অঞ্চলেও নানারকম অনুষ্ঠান পালিত হয়। এবং এসব অনুষ্ঠানে দেশি তাঁতের ('দেশি তাঁত' বলতে এখানে বুঝতে হবে 'হস্তচালিত তাঁত', আর পাওয়ার লুমেও কাপড় তাঁতেই তৈরি হয়) পোশাক পড়ার যে চল রয়েছে তা তো বলাই বাহুল্য। সেটা হতে পারে শাড়ি, ফতুয়া, পাঞ্জাবী কিংবা সালোয়ার কামিজ। বিভিন্ন উপলক্ষে শহরের শিক্ষিত নাগরিকদের জন্য তাদের রুচি ও আদর্শের সঙ্গে সংগতিপূর্ণ পোশাক সরবরাহের দায়িত্ব পালন করার কারণেই এইসব ফ্যাশন হাউস বা পোশাক নির্মাণ প্রতিষ্ঠানগুলো গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। ফলে দেখা যাচ্ছে রাজনীতির পাশাপাশি সংস্কৃতির সঙ্গেও তাঁতশিল্পের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে। মূলত সাংস্কৃতিক যোগসূত্রের কারণেই ফ্যাশন হাউসগুলোর মাধ্যমে শহরের মধ্যবিত্ত ও এলিট শ্রেণির মধ্যে তাঁতশিল্পের নতুন বাজার তৈরি হয়েছে।

তবে এখনো এই নগরকেন্দ্রিক ফ্যাশন হাউসগুলোর এলিট ও মধ্যবিত্তনির্ভর বাজার নয়, হস্তচালিত তাঁতশিল্পের সবচেয়ে বড় বাজার হচ্ছে শহর ও গ্রামের অগণিত মানুষ। প্রধানত কম দামি লুঙ্গি, শাড়ি, গামছা, চাদর ইত্যাদি হস্তচালিত তাঁতশিল্পের মূল পণ্য। ছোট-বড় বিভিন্ন হাটে পাইকার ও ব্যবসায়ীদের মাধ্যমে এইসব পণ্য দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে। তবে এই বিশাল বাজারে প্রবলভাবে ঢুকে পড়ছে পাওয়ার লুমের নানা পণ্য। পাওয়ার লুমের কম দামি ও সস্তা পণ্যের সাথে পাল্লা দিয়ে হস্তচালিত তাঁতশিল্প কতদিন টিকে থাকতে পারবে সেটা একটা বড় প্রশ্ন।

একুশ শতকের পরিস্থিতি : সমস্যা ও সম্ভাবনা

এ পর্যন্ত যে আলোচনা করা হলো তাতে দেখা যাচ্ছে বাংলাদেশের তাঁতশিল্প নানা উত্থান-পতনের ভেতর দিয়ে প্রবাহিত হয়ে আজো বিদ্যমান। এদেশের অর্থনীতি মূলত কৃষির উপর নির্ভরশীল হলেও যে সমৃদ্ধ অতীতের গল্প আমরা শুনি–তা তো রূপকথা নয়! এই সমৃদ্ধির অন্যতম মূল কারণ ছিলো এদেশের তাঁতশিল্প। বলতে গেলে বিশ্বের অনেকটা অঞ্চল জুড়ে বিভিন্ন রকমের বস্ত্র রপ্তানি করে দেশের মানুষ যথেষ্ট সমৃদ্ধি অর্জন করেছিল। সারা পৃথিবীর একটি বড় অংশের বস্ত্রের চাহিদা পূরণ করতো বাংলাদেশ। বাংলা অঞ্চলকে তখন বলা হতো পৃথিবীর তাঁতঘর।

তৈরি পোশাক কারখানার উত্থান

কালের পরিক্রমায় ক্রমশ এই 'তাঁতঘর' পরিণত হয়েছে 'দর্জিঘরে'। বাংলাদেশ হয়ে উঠেছে তৈরি পোশাক প্রস্তুতকারক দেশ হিসেবে পৃথিবীর অন্যতম প্রধান কেন্দ্র। রেডিমেড গার্মেন্টস বা তৈরি পোশাকের কারখানা এবং এর সঙ্গে যুক্ত বিভিন্ন পেশা হয়ে উঠেছে বাংলাদেশের মানুষের অন্যতম কর্মক্ষেত্র। এখন সারা পৃথিবীর পোশাকের একটা বড় অংশ তৈরি হয় বাংলাদেশে। গবেষকরা মনে করেন, সস্তা শ্রমের সহজলভ্যতা, কম মজুরি, কম উৎপাদন খরচ ইত্যাদি নানা কারণে এদেশে তৈরি পোশাকের কারখানা বা গার্মেন্টস ইন্ডাস্ট্রিজ-এর উত্থান ঘটেছে। বড় বড় মাল্টি-ন্যাশনাল কোম্পানীগুলো তাদের তৈরি পোশাক কারখানাগুলো নিজের দেশে না করে বাংলাদেশসহ আরো অনেক দেশে স্থাপন করেছে। এর ফল হয়েছে এই যে, বাংলাদেশসহ অন্যান্য দেশে (যেমন- ভারত, শ্রীলংকা, ইন্দোনেশিয়া ইত্যাদি) তাদের নিজস্ব ঐতিহ্যবাহী তাঁতশিল্প বিকশিত হবার পথ অনেকটাই

রুদ্ধ হয়ে গেছে। সন্দেহ নেই, তৈরি পোশাক রপ্তানী করে বাংলাদেশ বড় অংকের টাকা আয় করে প্রতিবছর। এভাবে রপ্তানী আয় বাড়লেও দেশের নিজস্ব তাঁতশিল্প বড় রকমের সংকটের মুখে পড়েছে।

জামদানি বয়নরত তাঁতি, রূপগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ

মোটামুটি, বিশ শতকের আশির দশক থেকে বাংলাদেশে তৈরি পোশাক কারখানাগুলো বিকশিত হতে আরম্ভ করেছে। এবং বিশ শতকের মধ্যেই তা কর্মসংস্থান ও আয়ের গুরুত্বপূর্ণ উৎস হয়ে উঠেছে। স্থানীয় বাজার ও সংস্কৃতিতে এর প্রভাব পড়েছে উল্লেখযোগ্য মাত্রায়। দেশের কেন্দ্রীয় ক্ষমতাকাঠামোর উল্লেখযোগ্য অংশ প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষাভাবে এই গার্মেন্টেস ব্যবসায় যুক্ত। ফলে রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতা পেতেও কোন অসুবিধা হয়নি। এইসব উন্নয়ণের জোয়ারে অনেকটাই নাজুক অবস্থায় পড়েছে বাংলাদেশের তাঁতশিল্প।

একটা উদাহরণ দিলে বিষয়টি বুঝতে সুবিধা হবে। সবাই জানে, শীতলক্ষ্যা পাড়ে শত শত বছর ধরে গড়ে উঠেছে ঐতিহ্যবাহী জামদানি ও মসলিনের উৎপাদন কেন্দ্র। এই অঞ্চলে উৎপাদিত সূক্ষ্ম ও নকশাদার বস্ত্র একসময় সুদুর ইউরোপের রোমান কিংবা ফরাসী রাণী কিংবা রাজকন্যাদের অতিশয় আগ্রহের বিষয় ছিল। কিংবা মুঘল সম্রাজ্ঞী নুরজাহান থেকে শুরু করে আরো কত উচ্চবর্গীয় ও ধনিক শ্রেণির নারী ও পুরুষের সৌন্দর্য বর্ধন করেছে বাংলাদেশের জামদানি ও মসলিন– সেসব তো শুধু গল্প-গাঁথা নয়–বাস্তব ইতিহাস ও সত্য ঘটনা। কিংবদন্তির জামদানি আজো তৈরি হয় শীতলক্ষ্যার পাড়ে, রূপগঞ্জ ও সোনারগাঁয়ের বিভিন্ন গ্রামে। মূলত বংশ পরম্পরায় ও গুরু-শিষ্য পরম্পরায় প্রবাহিত হয়ে আসছে জামদানির বুনন কৌশল। অথচ, সাম্প্রতিক সমীক্ষায় দেখা যাচ্ছে, জামদানি তাঁতির ছেলে কিংবা মেয়ে আর জামদানি বয়নে আগ্রহী হচ্ছে না। তাঁতি বাবা-মাও চায় না ছেলে বা মেয়েটা তাঁতের কাজ করুক। বরং কোন তৈরি পোশাক কারখানায় (কিংবা এ জাতীয় কোন কিছুতে) শ্রমিক হিসেবে কাজ করবে তার সন্তান–এমনটাই যেন আগ্রহ একালের জামদানি তাঁতিদের ভেতর। এভাবে তৈরি পোশাক কিংবা এজাতীয় আধুনিক শিল্প কারখানার নেতিবাচক প্রভাব পড়েছে তাঁতশিল্পের উপর।

সরকারী উদ্যোগের অপ্রতুলতা

বাংলাদেশ সরকারের বেশ কয়েকটি প্রতিষ্ঠান তাঁতশিল্প ও ফ্যাশন নিয়ে কম-বেশি কাজ করে থাকে। এগুলোর মধ্যে বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড, বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প কর্পোরেশন, বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশন–এই তিনটি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। এছাড়াও, এক্সপোর্ট প্রমোশন ব্যুরো তাঁতপণ্য রপ্তানি সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে এবং এসএমই ফাউন্ডেশন ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোক্তাদের নিয়ে কমবেশি কাজ করে থাকে। কিন্তু এই প্রতিষ্ঠানগুলো তাঁতশিল্প নিয়ে খুব কার্যকর কোন পদক্ষেপ নিয়েছে বলে মনে হয় না। মূলত তাঁতপল্লী নির্মাণ, ঋণ বিতরণ, প্রদর্শনী ও কর্মশালা আয়োজন –এধরণের কর্মসূচীর মধ্যে এসব প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম সীমাবদ্ধ।

একটি অঞ্চলে যে কোন শিল্প বিকশিত হবার প্রাথমিক শর্ত হলো স্থানীয় পর্যায়ে উৎপাদন-উপকরণের সহজলভ্যতা। তাঁতশিল্পের যে মূল কাঁচামাল–তুলা, সুতা, রঙের সরঞ্জাম ইত্যাদি বিষয়ে

কোন উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ হাতে নিয়েছে বলে জানা যায় না। আমাদের দেশ এখন তুলা, সুতা কিংবা রঞ্জনপ্রক্রিয়া নিয়ে সম্পূর্ণভাবে আমদানির উপর নির্ভরশীল। বেসরকারী পর্যায়ে এধরনের জটিল ও দীর্ঘমেয়াদি সমস্যা সমাধান করা– একরকম অসম্ভবই বলা চলে। তবে যথাযথ সরকারী পদক্ষেপ হাতে নিলে বাংলাদেশের তাঁতশিল্প বিকশিত হবার সম্ভাবনা এখনো বন্ধ হয়ে যায়নি।

প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা যেতে পারে, বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে বিলুপ্ত ফুটি কার্পাস নতুন করে আবিষ্কার করা হচ্ছে। শুধু তাই নয়, সেই তুলা চাষ করে তা দিয়ে চরকার সাহায্যে হাতে কাটা সূক্ষ্ম সুতা কাটা সম্ভবও হয়েছে। ফলে, জামদানি তাঁতিদের সাহায্য নিয়ে পুনরায় মসলিন বোনার প্রক্রিয়া ছোট পরিসরে হলেও চেষ্টা অব্যাহত আছে। কিন্তু বানিজ্যিকভাবে মসলিনের উৎপাদন এখনো শুরু হয়নি–এটা এখনো পরীক্ষামূলক পর্যায়ে রয়ে গেছে।

বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাক্রমে তাঁতশিল্প ও ফ্যাশন

আমরা আগেই আলোচনা করেছি যে, ব্রিটিশ শাসনামলে সরকারী উদ্যোগে বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বয়ন বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। ঢাকায় প্রতিষ্ঠিত এরকম একটি বয়ন বিদ্যালয় (নারিন্দা, ১৯২১) এখন বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত হয়েছে। ঢাকার তেজগাঁও শিল্প এলাকায় এই টেক্সটাইল বিশ্ববিদ্যালয়টি অবস্থিত। কিন্তু আশ্চর্য্য যে, এখানে বাংলাদেশের ঐতিহ্যবাহী তাঁতশিল্প নিয়ে তেমন কিছু পড়ানো হয় না বললেই চলে। এর শিক্ষাক্রমে তাঁতশিল্পের অনুপস্থিতি– এদেশের তাঁতশিল্পের বিকাশে একটি বড় মাপের প্রতিবন্ধকতা।

এছাড়াও বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বেশ কিছু শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বিশেষ করে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে ফ্যাশন ডিজাইন ও টেক্সটাইল বিষয়ে শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ রয়েছে। যেমন- বিজিএমইএ ইউনিভার্সিটি অব ফ্যাশন এন্ড টেকনোলজি, শান্ত-মারিয়ম ইউনিভার্সিটি অব ক্রিয়েটিভ টেকনোলজি ইত্যাদি। কিন্তু এগুলোর কোনটার একাডেমিক শিক্ষাক্রমে দেশিয় তাঁতশিল্প নিয়ে জানার সুযোগ যথেষ্ট সুযোগ রয়েছে বলে মনে হয় না। বরং এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষাক্রম তৈরি করা হয়েছে তৈরি পোশাক প্রস্তুতকারী কারখানাগুলোতে বিদেশি বায়ারদের চাহিদা ও প্রয়োজন মেটানোর উপযোগী করে। দেশি বা ঐতিহ্যবাহী তাঁতশিল্প নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করা কিংবা এর বিকাশের কোন লক্ষ্য-উদ্দেশ্য নিয়ে এসব প্রতিষ্ঠান তৈরি হয়নি। সে কারণে দেশি তাঁতশিল্পের বিকাশ ও দেশি ফ্যাশনের উন্নতি এসব প্রতিষ্ঠানের মনোযোগের বিষয় হয়ে উঠেনি।

ফ্যাশন ডিজাইনারের সংকট

বাংলাদেশে ফ্যাশন ডিজাইনারের সংকট এক জটিল ও বহুমাত্রিক বাস্তবতা, যার শিকড় নিহিত রয়েছে শিক্ষা, নীতি ও শিল্পায়নের সীমাবদ্ধতায়। দেশের ফ্যাশনশিল্প ঐতিহ্য ও কৌশলের দিক থেকে সমৃদ্ধ হলেও, এর সংগঠিত বিকাশ ও বৈশ্বিক সংযোগের ঘাটতি এখনো প্রকট। চারুকলা অনুষদ ও কিছু বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে ফ্যাশন ডিজাইন বিষয়ে শিক্ষা দেওয়া হলেও তা মূলত শৈল্পিক অনুশীলনের পর্যায়ে সীমাবদ্ধ; গবেষণা, বাজার বিশ্লেষণ, উপকরণ উদ্ভাবন ও আন্তর্জাতিক ব্র্যান্ড নির্মাণের বাস্তব প্রশিক্ষণ প্রায় অনুপস্থিত। ফলে শিক্ষার্থীরা পেশাগতভাবে দক্ষ হলেও বৈশ্বিক মানদণ্ডে নিজেদের অবস্থান সুদৃঢ় করতে পারছেন না। ফ্যাশনশিল্পকে এখনো পর্যন্ত রাষ্ট্রীয়ভাবে একটি সম্ভাবনাময় অর্থনৈতিক খাত হিসেবে বিবেচনা করা হয়নি; সরকারি পৃষ্ঠপোষকতা, নীতি সহায়তা ও উদ্যোক্তা উন্নয়নের অভাবও ডিজাইনার সৃষ্টির ক্ষেত্রে অন্যতম বাধা।

অন্যদিকে, বাংলাদেশের ফ্যাশনশিল্পে ঐতিহ্যবাহী বস্ত্র-যেমন তাঁত, জামদানি, খদ্দর বা মসলিন-নিয়ে কাজ করার প্রবণতা থাকলেও, সেই সৃজনশীলতাকে আন্তর্জাতিক ফ্যাশন অঙ্গনে রূপান্তরিত করার মতো পরিকল্পিত কৌশল দেখা যায় না। স্থানীয় ডিজাইনাররা দেশীয় রুচি ও সীমিত বাজারের

মধ্যে কাজ করেন, ফলে তাদের নকশা ও উপস্থাপনাও প্রায়ই বৈশ্বিক বাজারের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে পারে না। আন্তর্জাতিক ফ্যাশন সপ্তাহ, ব্র্যান্ড সহযোগিতা বা বৈদেশিক প্রদর্শনীতে বাংলাদেশের উপস্থিতি এখনও বিরল। বিখ্যাত মডেল বিবি রাসেল বাংলাদেশের ফ্যাশনচর্চাকে আন্তর্জাতিকভাবে আলোচনায় আনলেও, তার পরবর্তী প্রজন্মের ডিজাইনাররা সেই ধারাকে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে এগিয়ে নিতে পারেননি। এর পেছনে কাজ করছে পেশাদার নেটওয়ার্কের অভাব, পর্যাপ্ত তহবিলের সংকট এবং গবেষণাভিত্তিক ফ্যাশনচিন্তার অনুপস্থিতি। বাংলাদেশের ঐতিহ্যবাহী বয়নকৌশল ও নকশা যদি আধুনিক ফ্যাশনবোধ, বিপণন দক্ষতা ও আন্তর্জাতিক ব্র্যান্ড কৌশলের সঙ্গে যুক্ত করা যায়, তবে এই সংকট অনেকাংশে দূর হতে পারে। ফ্যাশন ডিজাইনার তৈরির জন্য প্রয়োজন সৃজনশীলতার পাশাপাশি গবেষণা, প্রযুক্তি ও উদ্যোক্তা মনোভাবের সমন্বিত বিকাশ-যা না হলে বাংলাদেশের ফ্যাশনশিল্প শুধু ঐতিহ্যের গর্বেই সীমাবদ্ধ থেকে যাবে, বৈশ্বিক ফ্যাশনের কেন্দ্রচর্চায় নয়।

কিছু স্বপ্ন, কিছু সম্ভাবনা

বাংলাদেশের তাঁতশিল্প কিংবা ফ্যাশনের সমস্যা ও সম্ভাবনা নিয়ে আলোচনা করতে গেলে অনিবার্যভাবেই রাজনীতি ও ঔপনিবেশিক প্রভাব এবং আন্তর্জাতিক বানিজ্য ও পুঁজিবাদ প্রসঙ্গে কিছু কথা বলা অত্যন্ত জরুরী। ইতোমধ্যে আলোচনা করা হয়েছে যে, ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক প্রভাবে কিভাবে বাংলাদেশের সমৃদ্ধ ঐতিহ্যবাহী তাঁতশিল্প ধ্বংস হয়েছে এবং ক্রমশ বিভিন্ন পরিবর্তনের সাথে খাপ খাইয়ে নিয়ে এদেশের তাঁতিরা কিভাবে ধারাবাহিকতা রক্ষা করে কাজ করে চলেছে। রাজনৈতিক প্রভাবেই (স্বদেশী আন্দোলন) একসময় দেশের ঐতিহ্যবাহী তাঁতশিল্প আবারও আলোচনায় এসেছিল। খাদি বা খদ্দরের প্রতি মানুষের আগ্রহ ও ভালোবাসা রাজনৈতিক সচেতনতা থেকে উৎসারিত হয়েছিল। যার ধারাবাহিকতায় ১৯৭১ সালে বাংলাদেশ স্বাধীনতা লাভ করলে এদেশের তাঁতশিল্প নতুন করে উজ্জীবিত হবার অনুকূল পরিবেশ খুঁজে পায়। সত্তর দশকের মাঝামাঝি এবং আশির দশকে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ বেসরকারি প্রতিষ্ঠান দেশের কারুশিল্প এবং কারুশিল্পীদের উন্নয়ণে সক্রিয় উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। কারিকা, আড়ং, কুমুদিনী, কোর দ্য জুট ওয়াকর্স ইত্যাদি প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রমে তাঁতশিল্পকে গুরুত্বের সাথে নেয়া হয়েছিল। নব্বইয়ের দশকে এবং তারপর এইসব উদ্যোগের ধারাবাহিকতায় আরো অনেক প্রতিষ্ঠান (কে ক্র্যাফট, দেশাল, অঞ্জন'স ইত্যাদি) দেশিয় তাঁতশিল্প নিয়ে কাজ শুরু করেছে–যা বাংলাদেশের তাঁতশিল্প ও ফ্যাশন ইন্ডাস্ট্রিজ-এর জন্য অত্যন্ত ইতিবাচক হয়েছে। একুশ শতকে দেশের তাঁতশিল্প ও ফ্যাশনের জন্য এসব প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তবে শুধুমাত্র দেশিয় তাঁতশিল্প নিয়ে কাজ করার আগ্রহ থাকলেও এসব প্রতিষ্ঠান এখন পাওয়ার লুমের কাপড়ই বেশি ব্যবহার করছে। আর দেশের বাজারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারলেও রপ্তানিখাতে এইসব প্রতিষ্ঠানের অংশগ্রহণ তেমন উল্লেখযোগ্য নয়।

গামছা শাড়ী, ছবি সৌজন্য: যথাশিল্প

রপ্তানিখাতে তৈরি পোশাকের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু প্রায়শই পোশাক শ্রমিকদের বেতন-ভাতা ও অন্যান্য সুযোগ সুবিধা নিয়ে আন্দোলন-সংগ্রাম ও সহিংসতায় তাদের মৃত্যুবরণ, সামাজিক-রাজনৈতিক অস্থিরতা, ইত্যাদি ঘটনার প্রভাব উল্লেখযোগ্য মাত্রায় দেশের তাঁতশিল্প ও ফ্যাশনের উপর পড়েছে।

এছাড়াও, পৃথিবীব্যাপি জলবায়ু পরিবর্তন এবং এর নেতিবাচক প্রভাব নিয়ে বিস্তর সচেতনতা তৈরি হয়েছে। একুশ শতকে পরিবেশবান্ধব ও টেকসই উন্নয়ণের ধারণা ক্রমশ জনপ্রিয় হয়েছে। এর প্রভাব পড়েছে দেশের তাঁতশিল্প ও

ফ্যাশনের উপর। ইন্ডাস্ট্রিয়াল পণ্যের বিকল্প হিসেবে হাতে তৈরি ও পরিবেশবান্ধব উপকরণ দিয়ে তৈরি পণ্য বিষয়ে উদ্যোক্তা এবং ক্রেতা–উভয়পক্ষই আগ্রহী হয়ে উঠেছে। এর ফলে ঐতিহ্যবাহী তাঁতশিল্প ও ফ্যাশন নিয়ে নতুন সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে। অনেক তরুণ ফ্যাশন ডিজাইনার–পরিবেশবান্ধব উপকরণ ও মাধ্যম ব্যবহার করে দেশের শিল্প-সংস্কৃতি থেকে বিষয়বস্তু ও মোটিফ বেছে নিয়ে সমকালীন বাস্তবতায় মানানসই পোশাক ও অন্যান্য পণ্যের নকশা প্রণয়ণ করছেন–যা দেশে বিদেশে সমাদৃত হতে শুরু করেছে। এছাড়াও করোনা পরবর্তী বাস্তবতায় জীবন ও পরিবেশ নিয়ে পৃথিবী জুড়েই যে সচেতনতা তৈরি হয়েছে –তা এদেশের তাঁতশিল্প ও ফ্যাশনের জন্য নিঃসন্দেহে নতুন সম্ভাবনা তৈরি করেছে। এই সম্ভাবনা বহুদুর বিস্তৃত ও প্রসারিত হবে–তা নিঃসন্দেহে বলা যায় ।

উপসংহার

একুশ শতকের বাংলাদেশে তাঁতশিল্প ও ফ্যাশন–এই দুইটি ক্ষেত্রই যেন একে অপরের পরিপূরক, একদিকে ঐতিহ্যের শিকড়, অন্যদিকে আধুনিকতার ছোঁয়া। তাঁতশিল্প বাংলাদেশের ইতিহাস, সংস্কৃতি ও লোকজ জীবনের প্রতিচ্ছবি, যার বুননে মিশে আছে গ্রামীণ কারিগরের নিপুণতা, ধৈর্য ও রুচিশিল্পের এক অনন্য ঐতিহ্য। এই তাঁতই একসময় গ্রামীণ অর্থনীতির প্রাণশক্তি হিসেবে দেশের হাজারো পরিবারের জীবিকার উৎস ছিল। তবে বিশ্বায়ন, শিল্পায়ন ও যান্ত্রিক উৎপাদনের প্রভাবে এই ঐতিহ্য আজ নানা সংকটে জর্জরিত–কাঁচামালের উচ্চমূল্য, দক্ষ শ্রমিকের অভাব, পুঁজির স্বল্পতা, বাজারজাতকরণের সীমাবদ্ধতা এবং তরুণ প্রজন্মের আগ্রহহ্রাস তাঁতশিল্পকে একপ্রকার অস্তিত্বের লড়াইয়ে ঠেলে দিয়েছে। অন্যদিকে ফ্যাশন বাংলাদেশের তরুণ সমাজের জীবনধারার প্রতিফলন হয়ে উঠেছে–এটি কেবল পোশাক নয়, বরং জীবনদৃষ্টি, সংস্কৃতিচেতনা ও আত্মপ্রকাশের এক আধুনিক রূপ। আধুনিক ফ্যাশন বিশ্বে বাংলাদেশের ডিজাইনাররা এখন নিজেদের প্রতিভা ও সৃজনশীলতায় আন্তর্জাতিক পরিসরে পরিচিতি অর্জন করছেন, যেখানে তাঁতপণ্য ধীরে ধীরে একটি ট্রেন্ড হিসেবে পুনরুজ্জীবিত হচ্ছে। তাঁতের ঐতিহ্যবাহী বয়নকলা যখন ফ্যাশনের ডিজাইন, রঙ ও আধুনিক কাটিংয়ের সংমিশ্রণে নতুন রূপ পাচ্ছে, তখন তা তরুণ প্রজন্মের কাছে এক নবধারার স্টাইল স্টেটমেন্ট হয়ে উঠছে।

আজকের ফ্যাশন জগতে তাঁত আর কেবল শাড়ির সীমায় আবদ্ধ নয়–পাশাপাশি জামা, পাঞ্জাবি, স্কার্ফ, ব্যাগ ও গৃহসজ্জায়ও এটি ব্যবহৃত হচ্ছে, যা তাঁতশিল্পের বহুমাত্রিক সম্ভাবনা উন্মোচন করছে। দেশীয় ও আন্তর্জাতিক ফ্যাশন সপ্তাহ, অনলাইন মার্কেটপ্লেস এবং সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে তাঁতনির্ভর পোশাক ও অ্যাকসেসরিজের জনপ্রিয়তা প্রমাণ করে যে এই ঐতিহ্য আধুনিকতার সঙ্গে তাল মিলিয়ে নতুন করে বেঁচে উঠছে। সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগে তাঁতপল্লি উন্নয়ন, ডিজাইন প্রশিক্ষণ, কাঁচামাল সরবরাহে সহায়তা এবং রপ্তানির নতুন পথ উন্মুক্ত হলে তাঁতশিল্প আবারও বাংলাদেশের অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারবে। একইভাবে ফ্যাশন খাতেও প্রয়োজন টেকসই নকশা, পরিবেশবান্ধব উৎপাদন ও স্থানীয় ঐতিহ্যের প্রতি শ্রদ্ধাশীল দৃষ্টিভঙ্গি–যাতে ফ্যাশন কেবল আমদানিনির্ভর না হয়ে নিজস্ব সাংস্কৃতিক শিকড় থেকে শক্তি সঞ্চয় করতে পারে।

তাঁতশিল্প ও ফ্যাশন এই দুই ধারার সমন্বয় বাংলাদেশের জন্য কেবল সাংস্কৃতিক পুনর্জাগরণের নয়, বরং অর্থনৈতিক উন্নয়নেরও বড় সুযোগ সৃষ্টি করতে পারে। যখন একজন তাঁতি নিজের হাতে সুতার বুনন করেন এবং একজন ডিজাইনার সেই বুননকে আধুনিক পোশাকে রূপ দেন, তখন জন্ম নেয় ঐতিহ্য ও আধুনিকতার এক সৃজনশীল সংলাপ–যা বাংলাদেশের পরিচয়কে বৈশ্বিক মঞ্চে নতুনভাবে তুলে ধরতে সক্ষম। তাই প্রয়োজন এই দুই ক্ষেত্রের পারস্পরিক সহযোগিতা, নীতিগত সহায়তা ও প্রযুক্তিনির্ভর রূপান্তর। ডিজিটাল বিপণন, আন্তর্জাতিক ফ্যাশন প্রদর্শনী এবং স্থানীয় ব্র্যান্ডের উন্নয়নের মাধ্যমে তাঁত ও ফ্যাশন উভয়ই একসঙ্গে এগিয়ে যেতে পারে একটি টেকসই ও মর্যাদাপূর্ণ

ভবিষ্যতের পথে। সর্বোপরি বলা যায়, তাঁতশিল্পের ঐতিহ্য যদি ফ্যাশনের সৃজনশীলতার সঙ্গে যুক্ত হয়, তবে বাংলাদেশ তার সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে সংরক্ষণ করেই নয়, বরং তা দিয়ে নতুন প্রজন্মের জন্য এক আধুনিক, স্বনির্ভর ও বৈশ্বিক পরিচয়ে উজ্জ্বল শিল্পসম্ভাবনার দরজা উন্মোচন করতে পারবে। এভাবেই তাঁতশিল্প ও ফ্যাশন মিলেমিশে একুশ শতকের বাংলাদেশকে রঙ, বুনন ও রুচির এক নবজাগরণে পৌঁছে দিতে সক্ষম হবে।

তথ্যসূত্র

Awwal, Iftikhar-Ul (1983), *The Industrial Development of Bengal 1900-1939*, Dhaka: University Press Limited

Baines, Edward (1835), *History of the Cotton Manufacture in Great Britain*, London

Gillow, John & Barnard, Nicholas (1993), *Traditional Indian Textiles,* London : Thames & Hudson

Hossain, Hameeda (2010), *The Company Weavers of Bengal: The East India Company and the Organization of Textile Production in Bengal,* Dhaka: UPL

Mitra, Debendra Bijoy (1978), *The Cotton Weavers of Bengal 1757-1833*, Calcutta: Firma KLM Private Limited

Taylor, James (1840), *Topography of Dacca*, G. H. Huttman, Calcutta: Military Orphan Press

Watt, George and Brown, Parcy (1979) (first ed. 1903), *Arts and Crafts in India,* New Delhi: Cosmo Publications

আকন্দ, শাওন (২০১৮), *বাংলাদেশের তাঁতশিল্প*, ঢাকা: দেশাল

ওয়াইজ, জেমস (২০০০) (প্র. প্র. ১৮৮৩), *পূর্ববঙ্গের বিভিন্ন জাতি, বর্ণ ও পেশার বিবরণ* (প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় ভাগ) (সম্পা: মুনতাসীর মামুন ও অনুবাদ: ফওজুল করিম) ঢাকা: ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড

করিম, আবদুল (১৯৬৫), *ঢাকাই মসলিন*, ঢাকা: বাংলা একাডেমী

টেলর, জেমস (২০০১) (প্র. প্র. ১৮৪০), *কোম্পানী আমলে ঢাকা*, অনুবাদ: মোহাম্মদ আসাদুজ্জামান, ঢাকা: অবসর প্রকাশনা

বন্দ্যোপাধ্যায়, অমিয় কুমার (১৯৯০), *আবরণ, আভরণ*, কলিকাতা: পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ

বসু, ত্রৈলোক্যনাথ (১৯৬১), তাঁত ও রং, কলিকাতা-৯: শ্রীকালী প্রেস

রায়, নীহাররঞ্জন (১৪০২) (প্র. প্র. ১৩৫৬), *বাঙ্গালীর ইতিহাস: আদিপর্ব*, কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং

সেলিম, লালা রুখ (সম্পা.) (২০০৭), *চারু ও কারু কলা*, ঢাকা: বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি

[**Abstract :** Bangladesh's handloom industry stands at the intersection of heritage and livelihood: a living archive of millennia-old weaving traditions and the economic backbone of vast rural communities. Jamdani, Muslin, Katan, Khadi, and the everyday Gamchha are not merely fabrics; they embody Bengal's aesthetic intelligence, regional identity, social history, and artisanal creativity. Yet in the twenty-first century, the industry faces its most severe crisis—worsening market competition, soaring raw-material costs, the dominance of powerloom production, and the absence of policy support.

Handwoven textiles require time, skill, and high labour value, which makes them costlier, while artisans receive neither fair wages nor institutional protection, prompting many weavers to abandon their craft. The sector largely operates informally—without insurance, pension schemes, technological upgrading, or legal safeguards against counterfeit products. Thus, what still keeps handloom alive today is not a supportive industrial policy but a fragile blend of cultural sentiment, inherited passion, and a small circle of conscious consumers—an unsustainable foundation for a heritage industry.

In contrast, Bangladesh's fashion sector has evolved in a sharply different trajectory. Until the 1990s, clothing in the country functioned merely as a utilitarian commodity. But by the 2010s, fashion had transformed into a field of cultural capital—shaping identity, aesthetics, lifestyle branding, and a rapidly growing creative economy. Emerging designers, fashion houses, runway shows, online brands, photography, and style blogging have collectively positioned fashion as a vibrant urban industry. Fusion fashion became a defining trend—saris worn as capes, shortened panjabis, gamchha redesigned as scarves, and handloom fabrics turned into blazers, skirts, bags, even footwear. Fashion, therefore, is not only about preserving traditional textiles; it is about reimagining them into marketable, contemporary, narrative-driven lifestyle products. In doing so, the fashion industry has opened new streams of value, visibility, and global relevance for handloom—transforming cloth from a mere woven surface into a story, a concept, and a cultural brand.

Yet the two sectors are shaped by different forms of crisis. Handloom primarily faces production-based challenges; fashion, structural ones. Weavers fail to secure fair prices, while designers lose revenue to piracy and plagiarism. Handloom has labour, but not an organized market; fashion has a market, but lacks research, policy support, and sustainable infrastructure. Imported fast fashion, synthetic fabrics, and cheap machine-made textiles outpace handloom in both cost and speed. Meanwhile, the fashion sector struggles with raw-material shortages, environmental pressure, labour inequality, and weak export-level institutional capacity. Fake Jamdani, printed "Muslin," and Indian Banarasi knock-offs not only distort markets but also endanger the authenticity of indigenous craft, design, and intellectual property.

Even so, the most promising development lies in the emerging interdependence between the two industries. Handloom offers heritage; fashion gives it a contemporary language. The artisan weaves the fabric; the designer generates value. Rajshahi silk, Narsingdi saris, Tangail weaves, and Sunamganj gamchha are no longer merely regional products—they are potential brand-driven global commodities. In today's world, four categories dominate the premium fashion market: handmade, ethnic, sustainable, and story-based design. These are precisely where Bangladesh's handloom-fashion synergy holds its greatest future potential. With the right blend of public policy, investment incentives, artisan protection, design research, and international marketing, handloom can survive not just in museums but in modern markets, while fashion can evolve beyond imitation culture into a confident paradigm of "Bangladeshi aesthetics."

Ultimately, in the twenty-first century, the handloom and fashion sectors stand together at a crossroads of heritage preservation and modern economic reinvention. Their survival depends on integrated efforts—skill development, technological innovation, fair production systems, and strategic market expansion. The challenges are undeniable, but with planned, collaborative initiatives, handloom and fashion can jointly transform into a powerful engine of Bangladesh's creative economy—where tradition is not a burden of the past, but a resource for the future.]